

বঙ্গেশ্বর ।

—○::○::○—

অতাপাদিত্য ও রানপাল
প্রণেতা

শ্রীশ্রীশচকু ঘোষ, বি, এল,
প্রণয়ক ।

—৮:৫:—

উলুবেড়িয়া ।

—○::○::○—

উলুবেড়িয়া দূর্গল যন্ত্রে
শ্রীচুনিলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

—•—

১৩০২ ।

—•—

মূল্য ৥০ আট আনা মাত্র ।

উপহার।

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বাবু ~~সত্যেন্দ্রনাথ বসু~~

~~শ্রীযুক্ত~~

মহাশয়,—

যোপূর্ণাঙ্ক সকলের অধিকার প্রাপ্ত
আমি সেই সাধুসে এই ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আপনার
পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ~~কিন্তু~~ আপনার
পদপ্রান্তে বসিয়া অতীতের কত কথা নিখিতাম
সেদিন অনন্তকাল সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে। তা
কিন্তু সেদিনের স্মৃতি যায় না। এখনই নিভৃত
চিত্তায় সেই দিনের ছবি দেখিতে পাই তখনই
আপনার আকাজক্ষা শান্তিপূর্ণ দেবমূর্তি আমার
অন্ধকারময় হৃদয় আলোকিত করে। সেইদিনের
স্বার্থ আমার এই পুস্তক গ্রহণ করিলে চিরতার্থ
হইবে।

উলুবেড়িয়া,

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

২৮ এ ডিসেম্বর ১৮৯৯।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

যশোবন্ত ।

— ١٠٨٨ —

ଅନ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

- 455 -

ଜାତି-ବିକାଶ ନାହିଁ ।

୧୦୧୦ ଟିକିଆଲେ ଅର୍ଗାଂ ମାଟ୍ଟାତୁ ମାଟ୍ଟା ଦଶମର ମାଟ୍ଟା

মাগে এগ'দিন একটা দালক ও বালিকা। ভাটুরিয়ার হাফ বাফীর
প্রাঙ্গণে দেখা করিতেছে। রাজপ্রাসাদের সাজ সজ্জা ও দালক
বালিকার পরিচ্ছন্ন দেখিলে বেশ চমকিত হইয়া পোন মুসলমান
আদমীর ব'ড় বিস্ত বাস্তবিক ভাষা নচে। উহা ভাটুরিয়ার
হিন্দু জনীদার দ্বারা গনেশচত্র দিগ্ভেব ব'ড়ী। দালক হাফার
একমাত্র পুত্র চৈতন্য ও বালিকা হিন্দু কুমারী হাফার ব'ড়ী।
উভয়েই আফগান পরিচ্ছন্ন হুঁদিত, দেখিলে আফগান দালক
বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায় দুই শত বৎসর হইল আফ-
গানেরা বঙ্গ আফ্রিকার ব'ড়ীয়া মধ্যে সুনিশাল রাজ্য স্থাপন
করিয়াছে। কয়েক জন আফগান পরিবর্তনের প্র্যোক্ত এক
ভানা। বাহাদুর রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইতেন উ'হারা কি হিন্দু
কি মুসলমান সবলেনে সজ্জা আফগানের মত ধাবিতেন।
হুমেন কি নামেও কত পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা না হইলে

হিন্দু রাজকুমার ও রাজকুমারী চৈতন্য ও জৈন কুমারী নামে
অভিযুক্ত হইলেন না। রাজা গণেশ চন্দ্র অশ্বরে প্রকৃত হিন্দু।
নিম্নে অসংখ্য উদ্ধৃতি ও অসংখ্য উদ্ধৃতি হইলে সে চিত্রা সন্দেহ
উত্থাপন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনিও সত্যের আকর্ষণ
স্বীকার করেন। তাঁহার মারিমা তাহা না হইলে ভ্রম সমাজে
চলি যায় না। পুত্র কঙ্ককে নাস্তিক্যের পরিচয় অতি শিশু-
বয়স হইতে করিয়া দেখান হইত হইত, তাহাদের দাম দামী
সবই বা, দামদাম, দামক দামিকা দামনিভেই কথা বলে,
বামদাম দামদাম দাম নিভেই তাহাদের রহস্য দেখা। পিতা
মাতার কাছে যে দামদাম দাম, তাহাদের প্রাণ দামা আছে
বামক বামদাম তাহা দাম। তাহাদের দাম আকর্ষণ
যদিও দামদাম দাম দাম দাম দাম দাম তাহারা বড়ই
আনন্দিত হয় ও দামদামদামকে দামদামদাম মনে করে।
আপনার দামদাম বাহ্যিকের দামে বসিয়া পরিচয় দিতে যুগা বোধ
করে।

ইহাতে দামদামের বিষয় কিছুই নাট, আকর্ষণ আমরা কি
দেখিতে পারি। বাহ্যিক দামে দাম দাম দাম দামদামই
ইহুগোপ্য দাম দাম। তাহাদের মধ্যে অনেকই অদম
বসন্ত, তাহাদের দামদাম দাম তাহাদের দাম দাম। বাহ্যে
অদমের দাম দাম অদমের দাম দাম তাহাদের দাম তাহারা
জীবন পদাতি দামদাম দামদাম। কি অদমী দাম অদমী
সকলই তাহাদের দাম ও দাম করে। দামদামদাম মনে
করেন তাহারা দাম ও তাহাদের দামদাম এবং দাম দাম
মনে করেন দাম দাম দাম। সত্যই দাম দাম দাম।

কিন্তু একবার ইহাদের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই। রাজা গনেশচন্দ্রের প্রসাদের চারিদিকে সে আফগানী ধরণের উচ্চ কাচীর ভিগ, তাহার প্রসাদ সেরূপ আফগানী ধরণে চক মিহান ছিল, ইতালীয় বাড়ী আন সেরূপ নাহি। প্রায় দেড় শত বৎসর হুটগ ইংরাজরাজ বঙ্গ অধিকার করিয়াছেন। আফগান অধিকারের পর ছোট শত বৎসরের গাব সেরূপ বঙ্গদেশের গণী যাত্র অধিবাসীগণ আফগান রূপে পরিণত হইয়াছিলেন আজ ইংরাজরাজের দেড় শত বৎসর অধিকারের পর দেশের গণী যাত্র অধিবাসীগণ ইংরাজরূপে পরিণত হইতেছেন। ভূগোলা একবারও মনে করেন না যে তাহার বাড়ী অনেকের ইচ্ছা বাননার যত করণ না কেন তাহার প্রাথমিক ইংরেজের বিজয়ী হইবে নিশ্চয় হইতেছেন, তাহার অর্থাৎ সমস্ত সংস্কারী তাহাদের উত্তরবংশীয়গণ পরিচয় করিয়া চৈতন্যের দ্বারা জালালউদ্দিন হইবেন। তাহা কে বলিয়া? মানবজাতির ইতিহাসে এইরূপ কত পুনরাবৃত্তি আছে। আমরা ইতিহাসে পাঠ করি কেন? যাহারা আত্মপাল জ্ঞানে, মানে, দাম্পত্য ও স্বদেশ বিচৈতন্যের বঙ্গালীর দুঃখ স্থানীয় তাহা বাট ইহার উত্তর জানেন, আমরা তাহাদের মতের দিকে তাকাইয়া সময়ের স্রোতে আসিতেছি, কোথায় গাইব, ওগোঁছর জানেন।

বালক বালিকা মেলাঙ্গি মেলাঙ্গি করিতেছিল, সেট স্বদেশে একটি ককীর আসিয়া উপস্থিত হইল ও বালক বালিকাকে স্বার্থান্বিত মনে করিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া বসিল ও কারসিতে তাহাদের সন্তি কথোপকথন আবৃত্ত করিল। ককীর চৈতন্যের স্বর সুখী ও আফগান গৃহস্থ দেখিয়া তাহাকে

আকাশের বাতাস মনে 'জুরিবাড়িন'। ত'হার হাত দেখিয়া বলিল তোমা' নাম "জালালউদ্দীন" তুমি একজন দেশের বাদশাহ হইবে"। এই কথা শুনিয়া বালক বালিকা দুজনেই হাসিয়া উঠিল, ও বলিল ফকীর সাহেব ঠিক 'তাত' শুনিয়া মিথ্যা ছেলে' নাম জালালউদ্দীন বলিয়াছেন। নামও যেমন ঠিক বলিয়াছেন, সে যে ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবে তাহাও সেইরূপ ঠিক বলিয়াছেন। ফকীর অগত্যা হইয়া আবার বা কের হাত লইয়া অনেকক্ষণ পর্যালোচনা করিয়া ব'ললেন যথা আমি বলিয়াছি তাহা ঠিক। আবার ইচ্ছা হইলে এই বালক জালাল-উদ্দীন হইবে ও অনেক কাকেরকণে উদ্ধাব করিবে।

এইরূপ গোল হইতেছে শুনিয়া রাণী মৈমতী সেইখানে আসিলেন। বালক বালিকা দোড়িয়া তাঁহার নিকট যাওয়া তাঁহার দুই হাত ধরিল ও বালিকা বলিল "না এই ফকীর বলিতেছে দাদার নাম জালালউদ্দীন ও সে দেশের বাদশাহ হইবে"। মৈমতী একটু হাঁসিলেন, ফকীর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল আমি যথা বলিয়াছি তাহা সত্য। তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল "না তুমি অচিরে বঙ্গেশ্বরী হইবে। যেদিন তুমি বঙ্গেশ্বরী হইবে সেই দিন আমি অধিবাসী হইব।" এই বলিয়া ফকীর কোণার চাহিয়া গেল। গণেশ চন্দ্র যখন এই সকল কথা শুনিলেন, ফকীরের অনেক অশ্রুস্রাব করিলেন। কিন্তু ফকীরকে আর পাইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—::—

গঙ্গাসাগর বাজা ।

ভাটুবিয়া দিনাজপুরের একটা পরগণা, গনেশ চন্দ্র দিনাজ-
পুরেরও জমিদার ছিলেন । তিনি উত্তরাঢ়ি কায়স্থ । বর্ত্তমান
সময়ে দিনাজপুরের রাজাপা তাহারই ন্যায় বহুত । আমরা
যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আফগান আগমনবাল ।
পিতৃশত্ৰু হুলতান তখন রাজ্যে সমগ্রামনে আরও । পিতৃ
বন্ধু ও ভ্রাতৃশোণিতে পদপাশিত বশিয়া তিনি পিতৃ সিংহা-
সনে আশোচন করিয়াছিলেন । কহিত আছে তিনি যুদ্ধে
পিতৃ বৈ নিহত করিয়া শু ভ্রাতৃদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া
পিতৃসিংহাসনের পদ পদিত করিয়াছিলেন । যে দেশের
রাজা এইরূপ পিতৃশত্ৰু বৈদেশ একদাবে উৎসন্ন যায় নাই
কেন এই অশ্রুণ্য । রাজা এইরূপ অত্যাচারী হইলেও পিতৃবৈ
হস্তক্ষেপ করিতেন না । হুলতান তাহার অত্যাচারের মানা
কখন রাজপুত্রের বাহিরে হইত না । দেশের লোক জানিত
বাকীই তাহারই রাজা । রাজ্যে পিতৃবৈ উপর যোকে
শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল । বাকীরা নিতীক হৃদয়ে যথার্থ বিচার
করিতেন । যে গিয়াফটুক পিতৃ ও ভ্রাতৃ শোণিতপাত
করিতে প্রক্ষেপ করেন নাট । তিনিও বাকীকে উপেক্ষা
করিতে সাহস করেন নাট । এক সময় পাণী শীঘ্র করিতে
হাওয়া হুলতান ভ্রমক্রমে এক বিদবার একমাত্র পুত্রকে শরা-
ঘাত করিয়াছিলেন । বিধবা কাকীর নিবট হুলতানের নামে

নাগিন করিল। নিষ্ঠীক ও স্বায় পরায়ণ কাছী বজ্রেশ্বরের
নামে পরওয়াণা ব্যতির করিলেন। যথা সময়ে স্নানস্তান বিচার
আদানভে আশিস উপভিত্ত হইলেন। কাছী তাঁহাকে সামান্য
অপরায়ণ কাম অর্পিতও করিয়া সেই অর্প নিম্নবক্ষে দিবার
আদেশ করিলেন। স্নানস্তানও হস্তকণ্ঠ সেই অর্প নিম্নবক্ষে
কিলেন। সেই দিময়ানাদী সঙ্কটে হস্তা টাঙ্গিয়া দেহেল অদমা-
লত ভ্রমণে পর কাছী তদন্বিত বনিয়া স্নানস্তানকে সমস্ত
অভ্যর্থনা করিলে পর গিয়াতুর্দিন করিলেন যে ব্যাপনি স্বায়
নিচাব করিয়া কাছী বসিয়াছেন নতুবা বজ্রাঙ্গন হইতে উঠিলেই
এক তদন্বিত কাছীতে আপনাকে দিও করিয়া ফেলিলাম।
নিষ্ঠীক কাছী বসিলেন। সে স্নানস্তান করি পাছ আঁঠুতে রাখিয়া
না রাখিলেন তাহা হইলে কাছীর বেত এতজন ভাচার গিঠ
কাটিয়া শোণিত ব্যতির করিত। এতদূর নিষ্ঠীক ও স্বায়-
পরায়ণ বিচাবক ছিলেন বনিয়া রাজা অভ্যাচারী হইলেও মেমের
লোক অপেক্ষাকৃত শ্রুত ও শাস্তিতে দিন কাটাইত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বঙ্গদেশে অধিকাংশ
জমিদার গনেশ চন্দ্রের স্বায় এক এক চাকলা শাসন করিতেন।
উদাহরের অখ্যাতোদী ও পদাভিক সৈন্ত, বঙ্গুক ও কামান ছিল।
এবং তাহার অধিকাংশই গনেশ চন্দ্রের স্বায় বারহ ছিলেন।
গনেশ চন্দ্র একজন শিক্ষিত, উন্নতমনস্ক পরাক্রান্ত ও হিন্দু মুসল-
মান ভাতি বর্জক সমাহৃত, জমিদার ছিলেন। উহার রাজপ্রসাদ,
গড়, সেনানিবেশ, বারমখানা প্রভৃতি দেখিলে উহাকে একজন
প্রবল রাজা বলিয়াই বোধ হইত। তিনি স্বভাবের উন্নতি
কামনার নানা লোক হিতবর কার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন।

কিন্তু সর্বদা আকগান আমীরের জায় থাকিভেন ও পুত্র কডাকে সেই ভাবেই শিক্ষিত করিতে ভিণেন। তিনি পিতৃ ও প্রভু তথা গিলাসউদ্দীনকে আন্তরিক স্মৃতি করিভেন। কখন কখন তাঁহাকে মিস্তান-চুস্ত করিয়া প্রভাব গিলাসউদ্দীনকে আনিবার করিবার টেক্সা ভাবাব ভাবে জ্ঞানকরুত হইত। দ্বাদশ চৈনবতী ভাটাকে নিবস্ত করিয়া রাখিয়াছিভেন। ওহা হইয়া রাহান অসঙ্গত কামনা যে বর্তমান অজ্ঞান ও প্রকাটরা, ও বিফল মনোরথ হইলে যে কি মননাত হইবে তাহা প্রকাটরা ভাটাকে এতদিন দিক পথে রাখিয়াছিভেন। আজ একজন সামান্য কর্মীর কথায় ভাটার উদ্দেশ্য বিস্তারিত হইল। তিনি সেই কর্মীর আদেশ করিতে পারিভেন।

চৈনবতী প্রকৃত হিন্দু রমণী। তথাপি স্বামী ও পুত্রকডাকে সুগম্যানি দায় পরাইভেন। তাঁহারা যে সুগম্যানি দায়ার পাঠিভেন তাহাতেও আপত্তি করিভেন না। তবে গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস চেহা করিয়াও কখনও তাহাকে সেইরূপ দোষ খাদ্য খাওয়াইতে পারেন নাই। পুত্রকাদীন হিন্দু রমণীর দায় হিন্দু ধর্মে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি যখন বুঝিভেন যে স্বামী ও চিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়াছে, তিনি তাঁহার মনোরথ অজ্ঞ পথে লইবার জন্য সাগরে বাইবার প্রস্তাব করিভেন। বর্তমান মুক্তি দেপাইভেন গণেশ চন্দ্র কিছুকাল সন্তুষ্ট হইভেন না। বলিভেন সুলতান জানতে পারিলে তাহাকে নিশ্চয়ই হত করিয়া লইয়া বাইভেন। তিনি ভাটীর দ্বারা খাকিয়া সুলতানকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গজাগর বাইবার পথে সুলতানের হাত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে ?

চৈম্ববতী অতি হুশীয়া ছিলেন, তিনি স্বামীর কথাই অত্যন্ত মনে রাখা প্যাটগেন, কিন্তু আর কিছুকি করিলেন না । একে-বারে পুনরায় ঘরে বাটরা নিবপুত্র করিতে বসিলেন । গনেশ চন্দ্র রাজ কার্ণো বাড়িরে চলিয়া গেলেন ।

সমস্ত দিন গিরাছে কিন্তু চৈম্ববতীর পুত্র শেষ হয় নাট । গনেশ চন্দ্র বুঝিলেন কেন এত দীর্ঘ পুত্র তিনি দীর্ঘে দীর্ঘে পুত্রের ঘরে পল্লব করিলেন, দেখিলেন চৈম্ববতী খালে নিম্না বেন হিমচণ্ডে মঃশেব প্যানে মঃশা গোত্রী, তিনি চৈম্ব-বতীকে ডাবিলেন, এদিকে হুচ তার চৈম্বব, উত্তর নাট । তিনি চন্দ্র চাকর চন্দ্রা হাফে এত দরিলেন, তখন তার চৈম্বব হুচ বঃগেন "চৈম্বব আম্বাছ, আমার স্বামীকে স্মৃতি দাও, ও চাকর চন্দ্রা বঃ " চন্দ্রা বঃ কইরা দোপ-লেন স্বামী চন্দ্র : তখন চন্দ্র চন্দ্রা বলিলেন আম্বা চৈম্ববে পাচলাম বৈ : মঃ আম্বা বঃ চন্দ্র চন্দ্রা বঃ দিতে আম্বা : গনেশ চন্দ্রা বলিলেন আম্বা চৈম্বব হোমার দি, আমি গঃলাগবে যাচবার চন্দ্র বঃ দিতে আম্বা : সমস্ত আয়োজন । কিন্তু সামান্য বেশে অল্প দাঁড়ির সঙ্গে দাঁড়িতে হইলে কেহ জানিতে না পারে যে আম্বা চৈম্ববে দাঁড়িতে । চৌপলাবার চন্দ্র চৈম্বব চন্দ্র না মচিত এমন কই এ অঃকে কি আছে . স্বামীর কথাই তিনি চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র, সামান্য বঃজীর জার দাঁড়িতে হইলে যে কত কই ও বঃলা দাঁড়িতে হইবে তাহা ছুনিয়া গেলেন ।

গনেশ দিবস রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া পুত্র কতাকে তাহার বিষয় মন্ত্রের চতে দিয়া এক দিন রাতে অল্প অল্প বাজীর সঙ্গে

পদাঙ্গণের দাবী করিবেন। মনুষ্য সৃষ্টিকর্তার আপনাকে কত
কষ্ট দেয় তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ?

— :: —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

— :: —

পাত্যাক্তন ।

যেই অন্ধকার অমানিশার একখানি ক্ষুদ্র ভবী দেওয়ানী
ঘটতে পতাগত হইতেছিল। দু'প কুপ করিয়া দাঁড় পড়িতেছে।
আরোহীগণ প্রায় সকলই নিদ্রিত, নৌকা হৃদয় মনের নিকট
দিয়া আসিতেছে। অদূরে বুড়ী নামক গ্রাম। একটা স্ত্রীলোক
নিঃশব্দে রোগীর সেবার নিযুক্ত। রোগী তাহার দানী।
নৌকার নদে ও সাগরের নানু মিশ্রিত জল খাইয়া তাহার
বিস্মৃতির জায় কোথ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান
আরোহীগণ জানিতে পারিলেই তাহাদিগকে নানাইয়া দিবে
এই ভবে তাহারা বোনের সন্তান। এখনও প্রকাশ করে নাট।
রোগীর যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়িতেছে। তল জল করিয়া রোগী
ছট্‌কট্‌ করিতেছে। নৌকা পালতের তরঙ্গবানি ভেদ করিয়া
মহাশব্দে ফ্রেন্সেগে ছুটিয়াছে, আরোহীগণ মহাশব্দে নিদ্রিত।
সেই কক্ষ রোগীর সাহসবোধিতে এইকণ তাহাদের নিদ্রাহত
হয় নাট। ক্রমে রোগী অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, তাহার
চিংকাবে একে একে সকলের ঘুম ভাঙিল। আরোহীগণ গির
করিল রোগীর সূত্রে নিকট একজনকে ধুত্ব সকলে মরিবে কেন

তাহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া দেওয়া কর্তব্য নতুবা ক্রমে সকলের বিমূচিকা হইবে। তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ আদেশ হইল। পাল নাগিল নৌকাও তীরে লাগিল। এই ‘রোগী’ই আমাদেব গনেশচন্দ্র এবং গুপ্তাচার্য্যের দ্বারা হৈমবতী। গনেশ বজ্রায় অস্তির তিনি কিছুই বুঝিলেন না। হৈমবতীর অন্তঃস্রাব্দা শুকাইল। বুঝিলেন তাঁহারও দিন নিকট হইয়াছে। মৃত প্রায় স্বামীর মুখের দিকে দেখিলেন, অতিন্যাতর হইয়া সমুপস্থ আরোহীর পায় ধরিয়া বন্ধিলেন আমাকে রক্ষা কর আমার স্বামীর সামগ্র্য অল্পপ বিমূচিকা নয়, উদ্ধাকে ফেলিয়া দিওনা। কিন্তু সেই নির্মম বুদ্ধের বিছুতেই দয়া হইল না। সে বলিল গঙ্গাসাগরে মৃত্যু সৌভাগ্যের কথা, তোমার স্বামী আর নৌকায় থাকিলে অগতি হইবে শীঘ্র নামাইতে দেও। এই বলিয়া তিন চারি জন ধন্যধরি করিয়া বোম্বাকে তীরে তুলিয়া তাহাকে উত্তর শিরবে গুয়াইয়া আশীর তাহার। নৌকায় উঠিল। হৈমবতী লাফাইয়া পড়িতে বাইতেছিলেন। কিন্তু এনটা বাঁশ তাহার মাথায় বাজিল। সেই আঘাতে অচৈতন্য হইয়া নদীতে পড়িয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আবেগীরা এদিক ওদিক একটু খুঁজিল কিন্তু আর তাহাকে পাইল না।

গনেশ মৃত প্রায় হইয়া স্ট্রটপানে পড়িয়া রহিলেন। আরোহীরা নৌকা পুলিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই বৃষ্টি নাগিল। মূলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির ধারে গনেশের চৈতন্য হইল। তাহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি হাঁ করিয়া বৃষ্টির জল পাউতে লাগিলেন ক্রমে তাঁহার পিপাসা শান্তি হইল। রোগের দ্বন্দ্বনা কমিল কিন্তু উঠিবার

সামর্থ্য নাই, হৈমবতীকে ডাকিলেন। কোথায় হৈমবতী? সকলে তাঁকে কি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? শিররে হাত দিয়া বুঝিলেন তিনি মাটিতে। নোকার নয়। বুঝিলেন আরোহীরা তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। তাহা হৈমবতীও এসময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে!!! এ চিন্তা তাঁহার অমূল্য সোপ হইল। তাঁহার মরিতে ইচ্ছা হইল, মনে মনে ভাবিলেন আমি মরিলাম না কেন। ইচ্ছা হইল গড়াইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সামর্থ্য নাই।

ক্রমে স্বর্গোদয় হইল। গনেশ কখনও সূৰ্জ্জিত কখনও চৈতন্য প্রাপ্ত অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। সেই নিবিড় অঙ্গন চাইতে যে আর কখনও নাগবে গাইবেন তাঁহার সে আশা ছিলনা। কতকণ্ঠে বুঝা আসিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করিলে তাহাট তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল। একবার হৈমবতীর সেই স্নেহময় মুখ মনে পড়িল, পুত্র চৈতন্যের কথা মনে পড়িল, সেই সুদূর জন্মভূমির কথা মনে পড়িল। গনেশ চক্ষু আবার সূৰ্জ্জিত হইয়া সেই নদীর তীরে পড়িয়া রহিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

—•••—

সন্ন্যাসী ।

বিশেষ আঘাতে হৈমবতীর নৃত্যক ফাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার চৈতন্যশূন্য হইয়াছিল। নৃত্যে পড়িয়া ভাগিতে

ভাগিতে আসার গঙ্গাগঙ্গের মুখে বাঁটে লাগিলেন। তলে দৌড়
হইয়া রক্তশ্রোত বন্ধ হইল। তবৎপাতিপাত ক্রমে তাঁহাকে ছীবে
আনিয়া ফেলিল তখনও তাঁহার কিছুনাহ সজ্জা হয় নাই।
যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন এক খানি ওয়াকুতীরে কয়েক-
জন ছেলের মেয়ে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা
কত কথা তাঁহাকে ভিজ্ঞাপা করিয়া, তিনি কিছুকিছু বলিলেন
না। তাঁহার হৃদয় কাটিয়া বাইরেছিল। স্বামীর মৃতকালের
দুঃখানন্দের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে শেলু দ্বিধিতে ছিল।

পূর্বদিন দুর্গবর্ণনযেব বিনাম্বে একখানি দুজ ডিক্সি লইয়া
তাঁহাতে উঠিয়া গভীর রাতে ক্ষুদ্র নৌকা। অগ্রে ভাগাইয়া
গিলেন। কি মনে করিয়া অগ্রে ভাগিলেন তাহা তিনিই
জানেন। আত্মহত্যার ইচ্ছা হইলে অনায়াসে সমুদ্র খাঁপ দিতে
পারিতেন, কিন্তু ঠৈমবতী তাহা করিলেন না। অপর দুজ
নৌকায় উঠিয়া যথেষ্ট অগ্রে ভাগাইয়া দেওয়া আত্মহত্যা বই
আর কিছুই নয়। মৃদু আকাশে করিলেই পাওয়া যায় না।
জগদীশ্বরের অভিশাপ না হইলে কেহ কি মরিতে পারে?
আত্মহত্যাও ইচ্ছাশীল।

দুজ নৌকা তরঙ্গ নর্ষিতে নাটিতে চলিয়াছে। ঠৈমবতী
নিদ্রিত। কত দুখ তপ্ত তাঁহার মনে উদয় হইয়া তাঁহার তপিত
প্রাণকে শীতল করিতেছে। অভিশাপ পক্ষে নিদ্রা ও অশু কি
মুখ!!

একজন ভট্টাচার্য্যের সন্ন্যাসী ভাই হইতে এক দুজ নৌকা
দেখিতে পাঠিলেন। তিনি এক নৌকার একটা মাত্র জীলোক
আনোয়ী দেখিয়া চম্ব্বিত হইলেন বুঝিলেন কোন উপায়

ইহাকে রক্ষা না করিলে ইহার মৃত্যু নিশ্চয় । নৌকাখানি
 তীর হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে, ক্রমশঃই দূরে বাটেতেছে
 উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর একখানা নৌকা আনয়িত।
 চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কোনদিকে নৌকা নাই । তখন
 আর কাল বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসী লাফ দিয়া সমুদ্রে পড়িলেন
 ও সাঁতার দিয়া যাইয়া নৌকা ধরিবার চেষ্টা করিলেন । বহু
 কষ্টে সাঁতার দিয়া যাইয়া সন্ন্যাসী নৌকা ধরিলেন । তিনি
 এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার নৌকা বাহিয়া
 আনিবার সামর্থ্য ছিলনা । আর নৌকারও চালাইবার কোন
 রূপ যন্ত্র ছিলনা । সুতরাং নৌকা পূর্ববৎ যথেষ্ট বাটেতে
 লাগিল ।

সন্ন্যাসীর আগমনে হৈমবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল । সমুদ্রে
 সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন । সন্ন্যাসী
 শান্তমুখি দেখিয়া হৈমবতীর ভক্তি হইল । তাঁহাকে
 আপনার দুর্দশার কথা সমস্ত বলিলেন । সন্ন্যাসীর করুণ হৃদয়
 তাঁহার হৃৎক্ষেত্র বিগলিত হইল । তাঁহাকে আশ্বাস দিবার ভ্রম
 বলিলেন, “মা তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই । তুমি রাজরাণী
 হইবে, সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস করিওনা ।”

হৈমবতী সন্ন্যাসীর কথায় একটু হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি
 তখনই বিবাদে নিবাহীয়া গেল । সন্ন্যাসী বুঝিলেন হৈমবতী
 তাঁহার কথা কেবল স্তোভ বাক্য মনে করিলেন ।

সন্ন্যাসী কত চেষ্টা করিলেন নৌকা কিছুতেই তীরের দিকে
 নিতে পারিলেন না । তীরবেগে যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে
 করিতে নৌকা ভীষণ মৃত্যু মুখে ছুটিল । অনাহারে ও কষ্টে

হৈমবতী অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন । সন্ন্যাসী প্রাণপণে নৌকা তীরাভিমুখে গইবার জন্ত দুই হাতে দাঁড়ের কাষ করিতে লাগিলেন । অনাহারে ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া সন্ন্যাসী ক্রমে অচেতন্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন ।

আবার প্রভাত হইয়াছে । নৌকা এক অজানিত দেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছে । সন্ন্যাসী হৈমবতীকে লইয়া তীরে উঠিয়া লোকালয়ের অবেষণে চলিলেন । কতদূর বাইয়া একটা গ্রাম দেখিলেন । কিন্তু কোন লোক তাঁহাদের দেখিয়া বাহির হইল নহ । কাছে বাইয়া দেখিলেন কত শব পড়িয়া পচিতেছে, আর কত লোক বিস্মৃতিকারোগে মৃতপ্রায় হইয়া জল জল করিতেছে । সন্ন্যাসী তাহাদের জল দিয়া বাইয়া বন হইতে কি ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেন, যে রোগী ঔষধ খাইতে পারিল সেই বাঁচিয়া উঠিল । আর যাহারা ঔষধ খাইতে পারিলনা তাহারা মরিয়া গেল । সন্ন্যাসী ও হৈমবতী সাধ্যমত সকলের সেবা শুশ্রূষা করিলেন, সন্ন্যাসীর সাহস দেখিয়া হৈমবতীর ও সাহস হইল । একটা প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া শবরাশি দাহ করা হইল । তাহার পর সন্ন্যাসী সেই গ্রামটা পোড়াইয়া দিলেন, কেবল কয়েকটা পুরাতন ইষ্টক নির্মিত গৃহ ব্যতীত আর সকলই পুড়িয়া ছাই হইল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—•••••—

একি স্বপ্ন না প্রত্যাদেশ ।

ভাটুরিয়ার রাজবাড়ীতে একটা সুন্দর কক্ষে চৈতন্য নিদ্রিত ।
 পিতামাতার জন্ত বালক ভাবিয়া ভাবিয়া শীর্ণ হইয়াছে ।
 ভাতার আর সে শ্রী নাট । আজ মন্ত্রী অনেক করিয়া তাহাকে
 বুঝাইয়াছেন । আশা দিয়াছেন আজই প্রাতে তাহার পিতা
 মাতা কিরিয়া আসিবেন । এসংসারে আশাই অভাগ্যুর এক
 মাত্র অবলম্বন । রোগী রুগ্ন শয্যায়, ভাবিতেছে কাল ভাতার
 অস্থখ সারিবে । হৃৎকের নিশীড়নে বাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া
 গিয়াছে, বাতার জীবন হুর্কিসহ ভারবোধ চটতেছে, যেই আশার
 রেখা তাহার মনে সঞ্চার হইয়া অক্ষুটবরে বলে, “ চিরদিন
 কখনও সমান যাবনা, ” অমনি সে কোমর বান্ধিয়া আবার
 জীবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় । আল তুফানে পড়িয়া নৌকা ডুবু ডুবু,
 তবু আশা, কাল এ হুর্দিন থাকিবে না । মন্ত্রীর কথায় বালক
 বালিকা আশায় হৃদয় বাধিয়া স্থির হইয়া যুমাটয়াছে । ঠিক সে
 সময়ে গণেশচন্দ্র মৃতপ্রায়, তাঁহাকে নৌকা হইতে টানিয়া ফেলিয়া
 দিতেছে, সেই মুহূর্ত্তই বালক চৈতন্য ও বালিকা হিজন কুমারী
 স্বপ্ন দেখিল যেন তাহাদের পিতা বিমূঢ়িকার পীড়িত, মৃতপ্রায়,
 কতকগুলো লোকে জোরকরিয়া তাহাদের মায়ের নিবারণ না
 শুনিয়া তাঁহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিতে বাইতেছে, মা হৈহবতী
 তাঁহাকে ধরিতে বাইয়া না পারিয়া সমুদ্রে পড়িয়াগেলেন, বালক
 ও বালিকা ঠিক এক সময়ে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ভেদী

আৰ্ত্তনাদ করিয়া প্রাসাদ কুঁপাইয়া তুলিল, প্রাসাদবাসী সকলে
 বালক বালিকার কণ্ঠে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা
 প্রথমতঃ কিছুই বলিতে পারিলনা। পরে অনেক সাস্থনা
 করিলে উভয়েই একই রূপ ভয়াবহ অমঙ্গলের কথা বলিল।
 সকলেই স্তম্ভিত হইল, মন্ত্রী সকলকেই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন
 কিন্তু বুঝা তাঁহার মুখের চেহারায় তাঁহার মুখের আশ্বাস বাক্য
 যে কেবল মৌখিক তাহা বালক বালিকাও বুঝিল। পরে পুরোহিত
 আসিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমরা পাগল আপ-
 নার মৃদু স্বপ্ন দেখিলে পরের হয়, আমি কি বুঝাই নারায়ণকে
 প্রত্যক্ষ শত তুলসী দি। তোমরা ব্যস্ত হইওনা আমি ঠাকুরঘর
 হটতে আসি। এই বলিয়া সেই স্বৈতকেশ ও স্বৈতবেশ বৃদ্ধ
 ব্রাহ্মণ ঠাকুরঘরে যাইয়া হোম করিয়া নারায়ণকে তুলসীদিতে
 লাগিলেন, তাহার বোধ হইল যেন নারায়ণ কাঁপিতেছেন যেন
 ঠাকুরঘর ছলিতেছে, তুলসী ঠাকুরের মাথায় যেন রহিতেছেন।
 তিনি একমনে নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন যেন
 গণেশচন্দ্র ও হৈমবতী তাঁহার সম্মুখে তাঁহারা যেন দেবতা হইয়া
 আকাশে মিশাইয়াগেলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া ঠাকুর-
 ঘর হটতে বাহিরে আসিলেন। তখন অনেক বেলা হইয়াছে।
 বালক চৈতন্য ও বালিকা হিঙ্গল স্থির হইয়া ঠাকুরঘরের দ্বারের
 দাড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কি দাদা
 ঠাকুর বাবা ও মা কেমন আছেন, যেন দাদা ঠাকুর তাহাদের
 নিকট হটতে তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। পুরোহিত বলিলেন
 কোন ভয় নাই এই তুলসী লও, ও এই অর্ঘ্যপান কর, বালক
 ও বালিকা ভক্তিভাবে টাহাই করিল।

আজ এই বিশালপুরীর লোকসকলই বিমর্ষ । সে ছদ্মদিনে বঙ্গে ডাক ও কি ভাড়াবন্দের বন্দোবস্ত হইলনা । সুতরাং শীত্র-কোন সংবাদ পাইবার আশাওনাই । প্রভুর আদেশছিল যে তিনি যে সাগরে চলিলেন ইহা বাহিরে কেহজানিতে নাপারে, তাঁহার সন্ধানে অঝারোহী পাঠাইলে ত সকলেই জানিবে যে তিনি ছুর্গেনাই কিন্তু বালক বালিকার মুখে অলৌকিক স্বপ্নের কথা শুনিয়া যে কেন মন্ত্রী মন এত চঞ্চল হইল তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই বুঝিতে পারিলেননা । বালক বালিকা পুরোহিতের মিষ্ট কথার ভুলিল কিন্তু মন্ত্রী কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না । তাঁহার ধারণা হইল এতদ্বারা নর এ প্রত্যাদেশ । তিনি স্থির থাকিতে পারিলেননা, প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া চারিদিকে অঝারোহী প্রেরণ করিলেন ।

কিছুদিন পরে গঙ্গাসাগর হইতে সকলে প্রত্যাগত হইলেন । তাহারা প্রকাশ করিলেন যে গণেশ ও হৈমবতী বিস্মৃতিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । টেংমল ও হিঙ্গন কাঁদিয়া অস্থির হইল, মন্ত্রী, সেনাপতি, দুর্গপাল প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যগণ সকলেই অভিভূত হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন । মনুষ্যের বিপদ একা আসেনা । বিপদের উপর বিপদ । শ্রাক্ষের আযাজন হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল সুলতান গিয়াস উদ্দীন গণেশের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বহু সংখ্যক সৈন্ত লইয়া দুর্গ অক্রমণ করিবার জন্ত আসিতেছেন । মন্ত্রী যে সমস্ত অঝারোহী সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন তাহারই একজন গণেশের কোন নিকট জাতি শত্রুর অর্থে বশীভূত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পাণ্ডুরাং বাঁহুরা সুলতানকে সমস্ত

সংবাদ দিরাছে। সেই জাতি শত্রু মহেশচন্দ্র সিংহ বাহাকে গণেশ আজন্ম প্রতিপালন করিয়াছেন তিনিই গুপ্ত পথের সন্ধান বলিয়া মুলতানকে পাওয়া চাইতে মালদহের মধ্যদিয়া আজ ভাটুরিয়ায় আনিয়া সেই আজন্ম প্রতিপালনের ঋণ প্রতিশোধ করিয়াছেন। বৈদেশীক জাতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে নিন্দাকরেন তাহা কি কতক পরিমাণে সত্য নয়। আমরা কেবল অভিমান করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক দূর করিবার কি চেষ্টা করিতেছি? কোন জাতির ইতিহাস এরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত, জয়চন্দ্র না থাকিলে কি পৃথী পরাজিত হইত? না ভারতে যবন আসিত? এখন ও আমরা কি দেখিতে পাই। চাহিয়া দেখ দেখিবে বাঙ্গালি হৃদয়ে হিংসা ও ঘেঘে পরিপূর্ণ, কিসে আমাপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাশালী ও ধনী তাঁহাকে জয় করিব এ চিন্তা যেন বাঙ্গালীর মূল মন্ত্র দেখিবে স্বজাতির সহিত আমাদের মিল নাট। এক জন স্বজাতির প্রভু আমরা সহ্য করিতে পারিনা। কিন্তু অনায়াসে বৈদেশীকগণের পদ সেবার আপনায় জীবন সার্থক মনে করি। যত দিন হিংসা ও ঘেঘে আমাদের মন হইতে বিদূরিত ন হইবে, ততদিন আমরা পর পদ দলিত থাকিব।

—::—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—**—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাগনে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

বিষন্ত প্রভুত্বক মদ্রী প্রাচীর আয়োজনৈ ব্যত্ । চৈতন্য

বালক হইলেও পিতার পরোলোক সুখ কামনার ভিন্ন বালকের অবশ্য পালনীয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছে ।

তাহার যেই সুন্দরমুখে কালিয়ার ছায়া পড়িয়াছে । পিতা-মাতার কত আদরের ধন চৈতন্যর আজ যুগপৎ পিতৃমাতৃ হীন হইয়াছে । তাহার জীবনে যেন যুগ পরিবর্তন হইয়াগিয়াছে । অধচ গণেশ চন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া গিয়ছেন আজ দুই মাস হয়নাই । কায় এসংসারে সুখের দিন কত শীঘ্রই চলিয়া যায় ! সকলে যখন শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত সুযোগ বুঝিয়া গিয়াসউদ্দীন বহু সৈন্ত লইয়া ভাটুরিয়ার দুর্গ অবরোধ করিলেন মজী বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গরক্ষা করিতে পারিলেন না । সাধারণ সৈন্তগণ প্রভুর মৃত্যু সংবাদে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল । সেনাপতি সুলতান প্রদত্ত অর্গে বশীভূত হইয়া দুর্গ প্রবেশের গুপ্ত দ্বারের সন্ধান তাড়াতাড়ি বলিয়া পাঠাইলেন ! ! !

রাত্র দুই প্রহরের পর যখন সকলে নিদ্রিত সেই সময় একজন ছট্‌জন করিয়া যবন দুর্গে প্রবেশ করিল । তাহার দ্বার রক্ষক-দিকে চত্যা করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল তখন দলে দলে যবন দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল । পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক চৈতন্যর অর্দ্ধাহারে লীর্ণ তথাপি তরবারি হস্তে সকলের অগ্রে বাহির হইয়া প্রাণের মার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । এসংসারে তাহার আর কে আছে, কাহার জন্ত জীবন রাখিবে, তাহার সাহস দেখিয়া সুলতান আশ্চর্য্য হইলেন, আদেশ দিলেন “বালককে কেহ বধ করিওনা, সিংহ শাবক ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ কর” তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত মজী ও তাহার পুত্র বিনয় ও অনেক সৈন্ত সেই দিকে খুঁকিল, মৃত দেহের পাহাড় হইতে লাগিল, হিন্দুর

“হর হর মহাদেব,” ও যবনের “আল্লাহো,” রবে নৈশগগন ভেদ করিয়া দিগদিগান্তর কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে “হর হর মহাদেব” রব নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে বাকুদ খানায় আস্তান লাগিয়া দুর্গের এক অংশ উড়িয়াগেল। কত হিন্দু ও যবন একই মুহূর্ত্তেই চির দিনের মত অনন্ত ধামে চলিয়া গেল। হিন্দুরা ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিল। বিনয় ও চৈতন্য ডাকিল “হে দুর্গে দুর্গাতি নাশিনি এ কাল রাজি বেন আর প্রভাত না হয়”।

রাজি তাহাদের কথা শুনিলা, বথাসময়ে দিনমণি উদয়াচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, যবনের জয় হিন্দুর পরাজয়, কত হিন্দুব প্রাণ গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ধৃত হইয়াছে। তাহারা প্রাতে প্রাণ দণ্ড হইবে স্থির করিয়া সেই অজানিত দেশে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে ছিল। সুলতান গিরাসুদ্দীন স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিলেননা, পর দিন বথা সময়ে দরবারে বসিয়া বন্দিগণকে আনাইলেন। বাহারা আর কখন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেনা বলিয়া তামা তুলসী হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল তিনি তাহাদের ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন। আর বাহারা ঐরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিল তাহাদের বাবজীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন। এক জনের ও প্রাণ দণ্ড হইলনা। সর্বশেষে তিনি চৈতন্য, বিনয়, মন্ত্রী ও হিন্দন কুমারীকে আনিবার আদেশ দিলেন তাহারা যুদ্ধের নিয়মামুসারে বন্দী, তিনি চৈতন্য, মন্ত্রী ও বিনয়কে তামা তুলসি লইয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে বলিলেন। বালক চৈতন্য ক্রোধে

আত্মহারা হইয়াছিল। সে গীয়াসউদ্দীনকে “পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা” বলিয়া গালি দিল ও বলিল তিনি চোরের মতন তাহার হুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। নতুবা সে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিত, তিনি তাঁহার পিতার প্রতি পুত্রের শেষ কর্তব্য যে শ্রদ্ধা তাহা নষ্ট করিয়াছেন তাঁহার মত পিশাচের নিকট সে কোন অমুগ্রহ চাহেনা। মরিতে হয় মরিবে, একবার বই ছবার ত মরিবেনা। বৃদ্ধ মস্ত্রীর ছুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে ছিল, মস্ত্রী মনে করিলেন চৈৎগর যেরূপ উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে এখনই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু গীয়াসউদ্দীন তাহার কোন কথাই উত্তর দিলেন না, গ্রহরি দিগকে দ্বিজিত করিলে তাতারা তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেল। গীয়াসউদ্দীন দেখিলেন মস্ত্রী কানিতেছেন, তাঁহাকে বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ যুদ্ধের অমুগবৃদ্ধ, আপনি ঘাটেতে পারেন পরে দিনয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। বিনয় বলিল মরিতে একবার বই ছবার ভয়না, মরিতে হয় মরিব, আমি প্রতিজ্ঞা করিবনা। ভিজণ সুলতানের মুখেরদিকে অতি কাতরভাবে চাহিল ও বলিল “জগপনা আমার দাদাকে ও বিনয় দাদাকে রক্ষা করণ মা হুর্গা আপনার মঙ্গল করিবেন”। সুলতান বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন আমি কিস্থিব, উহারা আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিতেছে। উহারা আর বৃদ্ধ করিবেনা বলিলেই ত ছাড়িয়া দিতাম তোমাকে ও উহাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দিতাম। হিজন বলিলেন “বিনয় দাদা তোমাদের পায় পড়ি তোমরা সুলতান যাহা বলিতে বলেন তাহাই বল, চল আমরা ভিক্ষা করিয়া খুইব সেও ভাল, বাক্স ও মা চলিয়া গিয়াছেন

তোমরাও কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে ?” বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, উঠেঃস্বরে কাদিয়া উঠিল। কুমারীর বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, এই বয়সেই ‘হিঙ্গন বালিকা’ বয়সের শেষ সীমার উপস্থিত হইয়াছে। বিনয়, হিঙ্গন, ও চৈতন্যের ন্যায় রাজবাড়ীতে অপত্য নির্কিশেষে প্রতি পালিত হইয়া আসিয়াছেন। বিনয় হিঙ্গনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, হিঙ্গনের সহিত বিনয়ের বিবাহ দিবেন গণেশ ও হৈমবতী উভয়ের ইচ্ছা, কেবল মন্ত্রীর আপত্তি রাজকুমারীর থাকিবার উপযুক্ত প্রাসাদ তাঁহার নাই। যখন তিনি রাজকুমারীর জন্ম বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিবেন তখন বিবাহ দিবেন। গণেশ স্থির করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ দিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার কি হইবে, সেই সর্কনিয়ন্তার ইচ্ছা না হইলে কি হইবে ?

কুমারীকে কাদিতে দেখিয়া বিনয় বড়ই কাতর হইলেন পরে স্থির হইয়া বলিলেন, হিঙ্গন স্থির হও, তুমি রাজ কুমারী হইয়া এই দম্ভ্যর কাছে জীবন তিকা চাহিতেছ! বালিকা আর কাদিতে পারিল না, অতি দীন ভাবে স্নানতানের দিকে তাকাইল, স্নানতান বলিলেন তুমি তোমার দেশের রাজাকে দম্ভ্য বল তোমার প্রাণ দণ্ড করিয়া উচিত। প্রহরী লইয়া যাও। প্রহরীরা বিনয়কে লইয়া চলিয়া গেল, হিঙ্গনের মস্তক ঘূর্ণিতে লাগিল সে মুর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। স্নানতান তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেগমের শিবিরে লইয়া যাইতে বলিয়া থিয় মনে দরবার ডাকিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—:0:—

পাণ্ডুরা ।

একবৃন্তে দুইটা ফুল ।

আমাদের এই পাণ্ডুরা টেবণ পাণ্ডুরা নহে; মাগদহের দিকটু আকগান সুলতানগণের গোড়েরন্যায় আরএক রাজপুরী ছিল, সেই রাজপুরী পাণ্ডুরা নামে বিখ্যাত ছিল। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা যে একসময় অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা জানা যায়। সুলতান গিরাসউদ্দীন পাণ্ডুরার রাজপুরী অমর পুরীর ভার সাজাইয়া ছিলেন। তিনি মুসলমান সম্রাটগণের ভার বহু পত্রীক ছিলেন না। তাঁহার একটা মাত্র বেগম ছিলেন। তাহার এক পুত্র তাঁহার নাম সৈক উদ্দীন ও একমাত্র কন্যা সুলতানা রিজিয়া। রিজিয়া অতুলনিয়া সুন্দরী। রাজবালায় রূপে প্রাসাদ উদ্ভাসিত। তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর, তিনি এখন ও বালিকার ভার বিদ্যা ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মত। বিবাহের কথা হইলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। সেইজন্য গিরাস উদ্দীন এতদিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। আকগান আমীরগণ অতিশয় বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু বেগম বিশিষ্ট পুরী নাহিলে আমীর পুরী হয় না এই ধারণায় তাঁহারা শত শত বিবাহ করিতেন। অনেক আমীর ও জাইগীর দার রিজিয়া কে বেগম করিবার জন্য কত বস্ত্র ও চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি এইরূপ বেগম হইতে অস্বীকার করিয়া কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে জীবন কাটাইবেন স্থিরকরিয়া তাবা ও সঙ্গীত বিদ্যায় জীবন

উৎসর্গ করিয়া ছিলেন । তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল, রাজপুত্রী যেন তাঁহাকে পাইয়া হাসিত । তিনি বাহার নিকট যাউন সেই প্রফুল্ল হইত, সেইমনে করিত, তিনি তাঁহাকেই স্নেহ করেন : তাঁহাকে রাজপুত্রীতে সকলেই মান্ত করিত । রাজপুত্রীতে তাঁহার গতি অব্যাহত ।

• এই রাজপুত্রীতে চৈৎমল ও বিনয় বন্দী স্বরূপে অবস্থিত । তাঁহার বন্দী হইয়া রিজিয়ার কল্যাণে রাজ ভোগে অবস্থিত রিজিয়া প্রত্যহই তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করেন । চৈৎমল ও বিনয় উভয়েই রিজিয়া অতিশয় স্নেহ করেন । হিজগ তাঁহার সখী স্বরূপে সর্বদাই তাঁহাদের সহিত আসিয়া চৈৎমল ও বিনয় কে দেখিতে পান । এইহুদিনে তাহাদের মনে যতদূর শান্তি থাকিতে পারে তাহার জন্ত রিজিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করেন । পিতাকে বলিয়া বন্দী দুইজনের মুক্তির জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া ছিলেন । কিন্তু সুলতান কিছুতেই সন্মত হননাই । তিনি বলিয়াছেন উহার যতদিন তাঁহার ও তাহার বংশীয় সুলতান গনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেনা এই প্রতিজ্ঞা না করিলে তিনি ততদিন উহা দিগকে বন্দী অবস্থায় রাখিবেন । এবং উহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্ত সামান্য বন্দীর ন্যায় কারাগারে পাঠাইবেন সন্দেহ করিয়া ছিলেন । কিন্তু রিজিয়ার অমুরোধে তাহা এত দিন করিতে পারেন নাই !

রিজিয়া প্রেরিগগকে অর্থে বশীভূত করিয়া বন্দিগণের মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন স্থির করিয়া হিজগের সহিত পরামর্শ করিলেন । হিজগ জানিত গিয়াসউদ্দীন কোন্ দিন চৈৎমল ও বিনয়কে কাটিয়া ছেলিবেন, কেবল রিজিয়ার জন্য এতদিন

পারেন নাই। হিঙ্গন তাঁহার এই প্রত্যাবৃত্তি আশ্চর্য্য হইলেন বলিলেন, “সই তুমি দেবতা, তুমি দেবীর ন্যায় আমা-
দিগকে রক্ষা করিতেছ, তোমার বাধাতে বিপদ হইবে একপ
কায় আমরা করিবনা, রিজিয়া হিঙ্গনকে আদর করিয়া
বলিলেন, কাহার সাধ্য আমার কোন অনিষ্ট করে, আমার
ভয় পাছে কোন দিন বিনয় ও চৈতন্যের গর্ভিত তিরস্কার
বাক্যে পিতার জোঁধহয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ, মনে করিলেও
তোমার জন্ত আমার শরীর, সিঁহরিয়া উঠে। আমি বিনয় ও
চৈতন্যকে কত বুঝাইয়াছি, তাঁহারা পিতাকে, পিতৃহন্তা ভাতৃ-
হন্তা, পরস্বাপহারী দস্যু বলিয়া তাঁহার সম্মুখেই তাঁহাকে তিরস্কার
করেন। তাঁহারা বুঝেন না পিতার এক কথার তাঁহাদের শরীর
দ্বিখণ্ডিত হইবে। কাল পিতা যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন
তাঁহাতে কোন সময়ে যে কি হইবে বলা যায় না, তিনি কালই
উঁহাদের কারাগারে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার
মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পায় ধরিয়া উঁহাদের প্রাণ তিকা
করিয়া লইয়াছি। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি উঁহারা
রাজপুরী হইতে পলায়ন করিলে পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

হিঙ্গন বলিলেন “সই যাই কোথায়, খাই বা কি ? আমাদের
বথাসর্ব্বস্ব সব, তোমার পিতা” — এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হিঙ্গন
হঠাৎ ধামিরা গেলেন দেখিলেন রিজিয়ার চক্ষু জলে ভরিয়া আসি-
রাছে। তাঁহার মনে হইল আমি অকারণে সইয়ের মনে কষ্ট
দিয়াছি, আজি হুই বৎসর ছোট ভগিনীর মত যত্ন করিয়া যিনি
প্রতিপালন করিয়াছেন যিনি পিতৃকৃত অপরাধের প্রতিশোধের
জন্ত আপনার জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত তাঁহার মনে কষ্ট

দিয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি, এই ভাবিতে ভাবিতে হিঙ্গন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন “আমাকে ক্ষমাকর” রিজিয়াঁর চক্ষের কোণে যে এক ফোটা জল আসিয়াছিল তাহা ক্রমান্বয়ে পুড়িয়া, তিজিয়া নধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন “কেন ব’ন কি হইরাছে যে তোমাকে নাপ করিব ভূমিত কোন অপরাধ কর নাই। আমার এই ছোট ব’নটী কি আমার কাছে কোন অপরাধ করিতে পারে।” এই বলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে চুষন করিয়া এমনই নধুর আদর মাথা ভাবে তাঁহার সরল স্নানব মুখের দিকে চাহিলেন যে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও অশ্রুজলে কপোল ভাসিয়া গেল; উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া উভয়েই ভুলিলেন যে তাঁহারা ভিন্নভাতি ও একজন বন্দিনী ও অপরা রাজকুমারী। একবৃন্তে দুইটা ফুল কি সম্ভব? কেবলে হিন্দু মুসলমানে অপর বিদ্বেষ? হৃদয় হৃদয়ে মিলিতে হিন্দু মুসলমান প্রভেদ থাকে না।

রিজিয়াঁ বলিলেন “ব’ন টাকার ভাবনা কি? তুমি কি আমার টাকা লইতে সঙ্কোচ মনে কর।” এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া একটা বড় কোঁটা খুলিয়া দেখাইলেন, বলিলেন ইহা তোমার ও বিনয়ের বিবাহের সৌভূক, হিঙ্গন দেখিলেন উহা নানাবিধ বহুবল্য অলঙ্কারে ও অনেক স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। রিজিয়াঁ আরও বলিলেন, যখন তোমার দাদার বিবাহ হইবে, আমাকে সংবাদ দিও, আমি বাইয়া তোমার দাদার জীকে সহস্রে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিয়া আসিব। তোমার দাদা আমাকে বধন কড়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তুমি তা পারনা, তুমি আমি এক। এই জন্ত প্রচণ্ডর কাছে এই সব কথা বলিলাম।

তোমার দাদা কি বিনয় জানিতে পারিলে তোমাকে এই অলঙ্কার কি অর্থ লইতে দিবেন না, এই জন্ত ইহা তোমাকে লুকাইয়া লইতে হইবে।” হিঙ্গন ভাবিলেন রিজিয়া যখন কত্কা নহেন, তিনি পুরাণোক্ত কোন দেবী তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন ।

হিঙ্গন বলিলেন “সেই তোমার বাহাতে কষ্ট হইবে তাহা আমি করিণে আমার নরকে যাউতে হইবে, আমি অর্থ ও অলঙ্কার না লইলে তোমার মনে কষ্ট হইবে, সেই জন্ত আমি সবই লইব । কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা কর যখন তোমার বিবাহ হইবে তখন আমাকে সংবাদ দিও, আমি তোমাকে স্বহস্তে বিবাহের পূর্বে সাজাইব । জগদীশ্বর দিন দেন আমার ভুগে আমি সাজাইব, না দেন তোমার ভুগ লইয়া তোমাকে সাজাইব । যিনি তোমাকে বিবাহ করিবেন তিনি বুঝিবেন যে কোন্ দেবী তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন ।

রিজিয়া আবার মধুর হাসি হাসিলেন বলিলেন, “সে কবে হিঙ্গন, এজন্মে না পরজন্মে ? তবে তুমি যদি দেবতা হইতে তাহা হইলে আমি তোমার হৃদয় অধিকার কবিয়া তোমার হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতাম । তোমায় আমার কি বিবাহ হয় না হিঙ্গন ?” হিঙ্গন হাসিল । রিজিয়াও হাসিলেন, “বলিলেন, পাগলামি রাখ, চুল বাই দেখি চৈতন্য ও বিনয় কি করিতেছেন । ”

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—••••—

মানবী না দেবী ?

রাজপুত্রের এক প্রান্তে বিনয় ও চৈতন্য এক প্রাসাদে বন্দী, রাজভোগে থাকিয়াও তাঁহারা বন্দী বই আর কিছুই নহেন, তাঁহারা প্রাসাদে ও প্রাসাদস্থিত উপবনে যদিচ্ছ। ক্রমে বেড়াইতে পান কিন্তু বাহিরে যাউবার কোন উপায় নাই। আজ বিনয় ও চৈতন্য উভয়ে এই উপবনে বেড়াইতেছেন। আজ উভয়েই বিমর্ষ, গিয়াসউদ্দীন তাঁহাদের দেখিতে আসিয়া ছিলেন, চৈতন্যের উক্ত প্রভাবে বিরক্ত হইয়া তিনি আদেশ দিয়া গিয়াছেন, যে আজ হইতে তাঁহাদের সাধারণ কারাগারে রাখিতে হইবে। তিনি উহাদিগকে মুসলমান ধর্মাবলম্বন করিবার জন্ত ও হিজনের সহিত তাঁহার পৌত্র সমসুন্দীরের সহিত বিবাহদিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার এ প্রস্তাবে চৈতন্য ও বিনয় আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিবেন। কিন্তু তাহা নহা করিয়া উভয়েই তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া দর্পের সহিত বলিয়াছেন যে তাঁহারা মরিতে প্রস্তুত। চৈতন্য আরোও বলিয়াছেন যে হিজনকে তিনি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মহানন্দার জলে ভাসাইয়া দিতে প্রস্তুত তথাপি যবনের দাসী হইতে দিতে প্রস্তুত নহেন। যবনে ও কুকুরে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। চৈতন্যের মালাকালে মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিলনা, বরং অস্ত্রে যে তাঁহাকে মুসলমান আত্মির সন্তান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত

ভাহাতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন । কিন্তু পিতার মৃত্যু সংবাদেই পর হইতে তাঁহার জীবনে ভয়ানক পরি-
বর্তন হইয়াছিল । যে মুসলমানকে অস্ত্রে বধন বলিলে তাঁহার
কষ্ট হইত তিনি তাহাদিগকে বধন ভিন্ন অন্য নামে অভিহিত
করিতেন না । তিনি সৈফউদ্দীন ও সমসউদ্দীনের ঔদ্ধত্য
ও তাঁহাদের ঘৃণিত চরিত্র দেখিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া-
ছিলেন, তিনি গিয়াসউদ্দীনকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ।
কেবল রিজিয়া বধন রূপে আলো করিয়া মধুর কথার তাঁহার
বিপদে সহায়ত দেখাইতেন তখন রিজিয়াকে দেবী মনে
না করিয়া থাকিতে পারিতেন না । তিনি রিজিয়াকে ভক্তি
করিতেন সত্য, কিন্তু কখনও ভাল বাসার চক্ষে দেখিতেন না ।

অনেক ক্ষণ নিতরূপে পদচারণ করিতে করিতে বিনয় বলি-
লেন “চৈতন্য তুমি ভাল কর নাই, গিয়াসউদ্দীন দেশের
অগতান তাঁহাকে অপমান করা ভাল হয় নাই । বন্দী অব-
স্থায়ও তোমাকে কথক পরিমাণে স্থখে রাখিয়াছেন, কারাগারের
কষ্ট কি তোমার সহ্য হইবে ? হিংসাই বা তোমাকে না দেখিয়া
থাকিবে কি করিয়া ।” হিংসার নাগ উনিয়া চৈতন্যের চমক
ভাজিল, বলিলেন কি করিব, আমার ঋণ হয় না, সেই দিন যদি
মৃত্যু হইত ত ভাল হইত, জানি না কি পাণে এই কষ্ট পাই-
তেছি । হিংসার ভয় এখন ও মরিতে পারি না, নতুবা আমি
এক তরবারির আঘাতে আমার সমস্ত যজ্ঞগার শেষ করিতে
পারিতাম । যদি পিতা হিংসার বিবাহ দিয়া বাইতেন তাহা
হইলে আজ আমাকে এই বধনের ভয়ে ভীত হইতে হইত না ।
জীবনে সকলেরই বোন না কোন আশা আছে । আমার কি

আশা ? আমি জীবিত থাকিয়া আর কি করিব, চিরকাল এই
 বাহনের অন্ধ কারাগারে থাকিয়া কি সুখ, আমি ভাবিতেছি
 হিঙ্গনকে তোমার হাতে দিয়া আমি সেই অনন্ত ধামে চলিয়া
 যাইব। পিতা ও মাতা আমার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহারা
 আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের সহিত পৃথিবীর
 সকল সুখ চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যু বাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষণীয়
 হয় তাহাও তাঁহারা করিয়া দিয়াছেন আমি যে এখনও মরিতে
 পারিনাই সে কেবল আমার ভীকৃত্য। আমার মত অভাগার
 পক্ষে আত্মহত্যা মহাপাপ নয়, তাহার দ্বারা এ পৃথিবীর কোন
 রূপ উপকারের প্রত্যাশা আছে তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা মহাপাপ
 আমার পক্ষে নয়। মৃত্যুই এক্ষণে আমার পক্ষে উন্নত তর
 জীবনের সোপান।

বিনয় তাঁহার এই কথা শুনিয়া চমকিয় উঠিলেন। বলিলেন
 ছি ! চৈতন্য তোমার মনে এই সকল চিন্তা স্থান পাইয়াছে !
 মৃত্যু উন্নততর জীবনের পথ সত্য, সময় ক্রমে সেই পথে একদিন
 আমরা উঠিব সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মহত্যা করিয়া সেই পথে
 উঠিবার কাহারও অধিকার নাই। জগদীশ্বরের ইচ্ছা না হইলে
 কাহারও সেই পথে উঠিবার সমর্থ্য নাই। মৃত্যু সন্ধিহল,
 মৃত্যু উন্নতি ও অবনতির পথের মিলন স্থল, আজ আত্মহত্যা
 করিয়া তুমি সেই সন্ধিহল হইতে অবনতির পথে অগ্রসর হইবে।
 অনন্ত কাল ধরিয়া লোকে তোমাকে ভীক ও কাপুরুষ বলিবে।
 মৃত্যুতে তোমার আপাতত এই যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে
 কিন্তু পৃথিবীতে তুমি যে অপকীর্তি রাখিয়া যাইবে তাহার কি
 কখনও শেষ হইবে ? তুমি কেবল নিজের সুখের জন্য লালারিত

লোকে ইহাই কি ভাবিবে না? তুমি হিজনের দিকে তাকাইলে না, আমার দিকে তাকাইলে না, * নিজেস্বামী হইবে বলিয়া আশ্বহত্যা করিয়া কি তুমি যথার্থই স্বামী হইবে? তোমার আশ্বার কি তৃপ্তি হইবে? কখনই নয়, তোমাকে কোন্ অব-
নতির পথে বাইতে হইবে কে বলিতে পারে? আজ আমরা বন্দী ইচ্ছা করিলেই পলাইতে পারি, পলাই না কেন? না প্রাণ ভয়ে পলায়ন অপেক্ষা হীনতার কার্য আর কি আছে! সুল-
তান কি ভাবিবেন? দেশের লোকে কি মনে করিবে? এই জন্তই আমরা পলাই না। আশ্বহত্যা ও কি এইরূপ সংসার কারাগার হইতে পলায়ন করা নয়? যুগে দিন আমাদের শাস্তির দিন শেষ হইবে, আমরা জগদীশ্বরের আদেশ মত অনন্ত ধামে চলিয়া যাইব। আশ্বহত্যা করিয়া তুমি কখনও সেই অনন্ত ধামে পিতামাতার নিকট বাইতে পারিবে না।’

ঔহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় হিজন ও রিজিয়া সেই স্থানে আসিলেন। ঔহারা যে আসিয়াছেন তাহা বিনয় ও চৈতন্য জানিতে পারেন নাই। ঔহাদের কথা হইতে হিজন ও রিজিয়া উভয়েই বুঝিলেন যে কি সর্বনাশের কথা হইতেছে। রিজিয়া চৈতন্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ‘ছি স্বাণি কি বালক, বালকেও এইরূপ কাজ করেনা, আপনি কি মনে করেন? এতদিন কি চিরকাল থাকিবে, আপনি রাজ কুমার, পিতৃরাজ্য উদ্ধার না করিয়া কি বলিয়া পিতৃ সন্ন্যাসে উপস্থিত হইবেন। আপনি সাহসী যোদ্ধা, মরিতে আপনার ভয় নাই, স্তম্ভাং আপনি কারাগারেই বা যাইবেন কেন, আমি আজই আপনার মুক্তির উপায় করিয়া দিতেছি। আপনি

যথেষ্ট অস্ত্র লইউন, বাছিয়া অস্ত্র লইউন। আপনার গতি কেহ প্রতিরোধ করিবে না, যদি'কেহ করে, আপনি পথ পরিষ্কার করুন, আবশ্যক হয় বীরের জায় সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে পিতার নিকট চলিয়া যাইবেন। আপনি রাজকুমার আত্মহত্যার কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। রিজিয়া এই বুদ্ধিযুক্ত গর্ভিত বাক্য শুনিয়া চৈতন্যমগ্ন তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইলেন, দেখিলেন, সেই দেববিনিমি মুখে অহঙ্কারের ছায়া মাত্র নাই, সেই স্নিগ্ধ মধুর ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যেন কোন স্বর্গের সুরবালা সুরগুণী হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। একদার মনে হইল যেন সেই সুরগর আনত আননে একটু বিবাদের ছায়া পড়িয়াছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, তাঁহার ভ্রম, প্রক্ষুণ্ণিত গোলাপের জায় সেই মুগ্ধ হাসিতে ভরা।

চৈতন্যমগ্ন তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন প্রহরীগণ কিছুই জানেননা, হঠাৎ যাইয়া আমি তাহাদের আক্রমণ করিয়া বধ করিলে আমি নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইব। আমি একগুণ মুক্তির কামনা রাখি না। তাহা অপেক্ষা অন্ধকারাগারে থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

রিজিয়া বলিলেন আপনি প্রহরীদিগকে বধ করিযেন। কেন, আমি আপনাকে কণ্ঠহার দিয়া কেল্লার বাহির করিয়া দিব, প্রাসাদস্থিত কোন প্রহরীই আপনাকে আমার সহিত বাইতে দেখিলে কিছুই বলিবে না; আমি তাহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়াছি। আর যত অর্গের আবশ্যক তাহা আনিয়াছি, আপনি আমার দান গ্রহণ না করেন বৎস আপনার সম্মুখ হইবে আমার

নাগে একটা অনাথ নিবাস স্থাপন করিবেন, তাহা হইলেই অর্থ আমি পাইব। আর হিজনকে আপনারা সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহেন লইউন, না হয় আমার নিকট রাখিয়া যান, পরে যেখানে বলিবেন সেইখানে পাঠাইয়া দিব।

বিনয় তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, চৈতন্য রাজকুমারী যথার্থ দেবী, তুমি যে বল তিনি মানবী নহেন, অর্গ হইতে অবরোধ করিয়া কখন কখনও আমাদের সাধনা দিতে আইসেন তাহা সত্যই। তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্ত যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অল্পর উপায় আবার বুদ্ধ পিতা স্থির করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। চল আজই রাজে আমরা এই দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। হিজন এখন রাজকুমারীর নিকট থাকিবে, পরে আমার পিতার নিকট যাইবে।

চৈতন্য বলিলেন রাজে চোরের দ্বারা তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে প্রাসাদ হইতে বাইতে অসম্মত, কারণ গ্রহরীরা তাহা হইলে রাজকুমারীর চরিত্রে সন্দেহান হইবে। বাহাতে রাজকুমারীর দেব চরিত্রে সন্দেহের ছায়া পড়িতে পারে এক্রপ কার্য্য করিতে তিনি অসম্মত। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না রাজকুমারী যদি তাঁহাকে অঙ্গদান করেন তাহা হইলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিবেন। যখন তাঁহাকে স্কারাগারে লইয়া যাইবার জন্ত সৈন্য আসিবে তিনি সগজ থাকিলে তাহাদের সহিত বুদ্ধ করিয়া নিহত হইবেন। এবং সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।

রিজিয়া অতিকাতর কণ্ঠে বলিলেন “কুমার, জগদীশ্বর আপনাকে উন্নতির পথে যাইতে বলিতেছেন, কেন এক্রপে আত্ম-বলিদান করিবেন, ইহাও এক্রপ জ্ঞানহত্যা মাত্র, নিশ্চিত

মৃত্যু জানিয়া মৃত্যু আঁকাঙ্ক্ষায় সৈন্ত ও গ্রহরীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা কি আত্মহত্যা নয়? কুমার এখনও আপনি আপনার খুঁজিতেছেন, ছিলেনের কথা ভাবিলেন কৈ, আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে আমার কথা রাখুন, আমি স্তুখী হইব, বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে, কেহ ঝগড়ন করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি আপনি ইচ্ছা করিলে এখনও স্তুখী হইতে পারিবেন জগতের মঙ্গল করিতে পারিবেন।

দ্বৈতমন্ত্র তথাপি নিকন্তর। রিজিয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, কুমার একটা কথা আপনাকে বলিয়া কষ্ট দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তা না ভুলিলে আপনি বাইবেন না, আমি পিতার নিকট গিয়াছি আপনার পিতার বিস্মৃতিকা হইয়াছিল কিন্তু আপনার মাতার বিস্মৃতিকা হয় নাট, যে নরাদমণ্ডলের সহিত তাঁহার সাগরে গিয়াছিলেন তাহার তাহাদিগকে গহন কাননে হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তাহারই মধ্যে একজন আমার পিতাকে সংবাদ দিয়া লইয়া বাইয়া আপনার এই হৃদয়টা করিয়াছে। একজন ফকীর আসিয়া পিতাকে বলিয়াছেন যে আপনার পিতামাতা এখনও জীবিত আছেন এবং আপনার পিতা খচিরে বনের গিংহাগণে আরোহণ করিবেন। বাহাতে আপনার পিতা আর দেশে না আইসেন সেই জন্য আমার পিতা প্রচার করিয়াছেন যে আপনাকে তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছেন, আর হিন্দুকে মুসলমান করিয়া সব স্ত্রীকনের সহিত বিবাহ দিয়াছেন, এ সংবাদে আপনার মাতা মৃত্যু শয্যায়, আপনাকে দেখিতে চাহেন, আপনি গেলে

এখনও তিনি বাঁচিতে পারেন। ককীরের কথা কখনও মিথ্যা নয়, আপনার শিতা বথার্থই জীবিত, কিন্তু আপনি তাঁহার নিকট না গেলে তিনি বনে বনে সন্ন্যাসী থাকিয়াই জীবন অতি-বাহিত করিবেন, আর আপনাকে না দেখিয়া কতকষ্টে যে আপনার মাতার মৃত্যু হইবে, তাহা আপনিই মনে করুন, তাঁহার কথা শুনিয়া চৈতন্যের সেই বালককালের ককীরের কথা মনে হইল। আবার শিতা জীবিত, মাতা মৃত প্রায়। এই অন্ধ-কারাগারে থাকিলে এ জীবনে আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই এ চিন্তা অসহনীর বোধ হইল। রাজপুরী হইতে পলায়ন করাই স্থির করিলেন ।

—○:○○:○—

নবম পরিচ্ছেদ ।

—○:○:○—

ইরিতৈরপি বর্ত্তম আশ্বসাৎ ।

প্রযতন্তে নৃপুত্রনবোহিৎ ॥

তদুপস্থিতম-এহীনজঃ ।

পিতৃরাভ্যেতি নভোগত্কয়া ॥

কালীদাস ।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রচার হইল যে বন্দী দুইজনই পলায়ন করিয়াছে। কত অশ্রুসন্ধান হইল, কিছুতেই কোন সন্ধান পায় না। সৈকতকীন গ্রহরোগকে ধরিয়া অমাত্যিক

যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি তাহারা কিছুই স্বীকার করিল না। রিজিয়া বখন শুনিলেন তাঁহার কৃত কার্যের জন্ত প্রহরীগণ পৈশাচিক গীড়নে গীড়িত, তখন তাঁহার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিল, তিনি একেবারে সৈফউদ্দীনের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলেন, প্রহরিগণকে সুরাপানে অচেতন্ত করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে তিনি বন্দীগণকে ছাড়িয়া দিয়াছেন সে দোষ সমস্তই তাঁহার। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই কথা বলিলে প্রহরীরা নিস্তার পাইবে, কিন্তু তাঁহারা ভুল হইয়াছিল। সৈফউদ্দীন প্রহরীদিগকে অধিকতর গীড়ন আরম্ভ করিলেন। আর রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। বেগম আসিয়া কত অনুরণ বিনয় করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না, বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহরীদিগকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন আর রিজিয়াকেও কাটিবার আদেশ হইল।

গিয়াসউদ্দীন প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বখন শুনিলেন যে রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে লইয়া গিয়াও সৈফউদ্দীন সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিয়াছেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি রিজিয়াকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, নিজে কারাগারে যাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। এই সামান্য কারণে সৈফউদ্দীন বিজ্রোহী হইয়া সমস্ত বন্দীকে লইয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইয়া বিস্তর নৈরাজ্য সংগ্রহ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। গিয়াসউদ্দীন বুঝিলেন তিনি যে বিজ্রোহী হইয়া পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন এ তাহারই প্রতিশোধ। তিনি একে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন আবার,

যুদ্ধে পাছে পুত্র বা পৌত্র নিধন প্রাপ্ত হইয়া এই ভয়ে রীতিমত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না । কিন্তু উপযুক্ত পুত্র ও পৌত্র বৃদ্ধের জন্ত কিছুই তাঁহিলেন না, অনায়াসে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সৈফউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । রিজিয়া ও বেগমকে একঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন ।

হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্ত দাসীর বেশে রিজিয়া পূর্বেই তাঁহাকে রাজরাড়ী হস্তে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন । এই অপরাধে সমস্তদীন রিজিয়াকে বংশপরোনাতি কষ্ট দিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সেই চিরগ্রন্থ দেবীর কিছুই পরিবর্তন হইল না, তিনি মায়ের হৃৎথে হৃৎখিনি, কিসে মায়ের কষ্টের লাঘব হয় সর্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন । জননীকে আলংকার্যের স্পন্দ বরাং পড়িয়া শুনাইতেন । বেগম রাজরাজেশ্বরী হইয়াও যে সুখশান্তি তাঁহার মনে ছিল না, রিজিয়ার ধর্মতত্ত্বের কথা শুনিয়া কারাবাসিনী হইয়াও তাঁহার মনে ততোধিক শান্তি হইতে লাগিল ।

এদিকে সমস্তদীন পিতৃসিংহাসন লোলুপ হইয়া অতি অল্প দিনে বিধি প্রয়োগে সৈফউদ্দীনকে বধ করিয়াস্বীয় পথ পরিষ্কার করিলেন । মুসলমান শাসনকাল এইরূপ যে কত ঘৃণিত নৃশংস ব্যাপারে কলঙ্কিত তাহা কে বলিতে পারে । পিতা পুত্রের ভ্রাতা ভগিনীতে যে কোনরূপ মেঘের বন্ধন থাকিতে পারে তাহা তাঁহার জানিতেন না । অথবা আমরা মুসলমান রাজগণের দোষ দিই কেন । চাহিয়া দেখিলে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টীয়ান কত রাজবংশে এই নৃশংস ব্যাপার দৃষ্ট হোতর হইবে ।

রিজিয়া সর্বদা মায়ের সেবার নিযুক্ত, হুতরাং তাঁহার ভাবিবার সময় ছিল না। কিন্তু বখন নিশীথ নিম্নকে আপন হৃদয় কন্দরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত তখন দেখিতে পাইতেন যে তাঁহার হৃদয় মন্দিরে একটি দেবমূর্তি। সে মূর্তি কাহার তাহা কি আর বলিতে চাইবে? তিনি জানিতেন চৈতন্য কখনও তাঁহার হইবেন না। তথাপি তাঁহার হৃদয় চৈতন্য ময়। তিনি হৃদয়ের সেই নিভৃত কক্ষে সেই দেবমূর্তির ধ্যান করিতেন, ধ্যান করিয়াই সুখী। তিনি ভাল বাসিতেন সত্য কিন্তু প্রতিদানের প্রত্যাশিনী নহেন। পাছে হিঙ্গন কি চৈতন্য জানিতে পারেন এই ভয়ে কখনও বিশেষ আবশ্যক না হইলে চৈতন্যকে প্রাসাদে বাইতেন না। তিনি সকলের চুঃখেই সহায়ত্ব ববেন হিঙ্গন এই বুঝিয়াছিলেন। চৈতন্যও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। চৈতন্যের আধার হৃদয় ও তাঁহাকে পাইল আলোকিত হইত, তাঁহাকে দেবীমূর্তি ভাবিয়া পূজা করিতেন, ভক্তি করিতে উচ্ছা হইত। রিজিয়া বজ্রের স্কলতানের একমাত্র কন্যা, পিতার আদরে আদরিণী, চৈতন্য হিন্দু, কাকের, তাহাতে আবার বন্দী, তিনি কি তাঁহাকে ভাল বাসিতে কখনও সাহস করিতে পারেন?

দশম পরিচ্ছেদ।

—○:○:○—

কতক বা কত আয়ত:

তবু চিত্ত তদিতঃ ভ্রাতঃ।

মুর্ছা ভয়ের পর গণেশ দেখিলেন একজন সন্তাসী তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। মনে মনে কি ভাবিলেন, হৈমবতীর কথা স্মরণ হইল হৈমবতীর মনস্তত্ত্বের জন্ত তিনি গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিলেন, হৈমবতীর জন্ত এ জগতে কোন স্থানে তিনি বাইতে না পারেন, কোন কষ্ট না তিনি অনায়াসে সহিতে পারেন, হাসিতে হাসিতে শতবার মরিতে পারেন। সেই হৈমবতী তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা অসম্ভব, তাঁহার মৃতদেহের গতিকরিতে অসমর্থ হইলেও হৈমবতী গহনবনে তাঁহার মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া বাইতেছিল। সন্তাসী একমনে তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি অমাহুতিক যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন। বলিলেন “বৎস কেন মিছা মায়ায় বদ্ধ হইয়া সংসারী হও, যদি জী পুত্রকে ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে আজ আর কষ্ট পাইতে না। এ সংসারে কেহ কাহারও জী নয়, কেহ কাহারও পুত্র নয়, সকলই মায়ায় মোহ, অন্ধকার হইতে আসিয়া অন্ধ-কারে মিসাইয়া বাইতেছে, তথাপি মায়ায় মোহ ভাবিল না।

তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ এই চিন্তা কর, ক্রমে বুঝিবে সকলই মারা, পরে ভগবানকে পাইবে, ঐহিক ও পারলৌকিক অমরতা লাভ করিবে । আমার সহিত এখন আমার আশ্রমে চল । গণেশ উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য নাই, সন্ন্যাসী তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তাঁহার মুখে কি ঢালিয়া দিলেন, সেই অমৃত পান করিয়া তাঁহার শরীর সবল হইল । মন সতেজ হইল, বলিলেন “ সন্ন্যাসী ঠাকুর আমি তোমার শিষ্য হইব, আমার কেহ নাই, আমার ঋণী ঘর নাই, আমি এ সংসারে বৃত । আমি তোমার কাছে থাকিরা সেই পরম পুরুষের চিন্তা করিতে শিখা করিব । ” সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এখনও হৈমবতী চৈতন্য ও হিংস্রের চিন্তায় তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন, তুমি কি করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা শিখা করিবে । গণেশ অবাক হইলেন । তিনি যে সেই মুহূর্ত্তে হৈমবতী, চৈতন্য, ও হিংস্রের চিন্তা করিতেছিলেন তাহা সন্ন্যাসী বুঝিলেন কি করিয়া, সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী ? সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, আমি অন্তর্যামী নই, আমি তোমাকে চিনি, আমি ককীৰ-সন্ন্যাসী, ভারতের সর্বত্র আমি বাই, আমি ভাঁটুরিয়ার রাজা গণেশ চন্দ্র সিংহকে চিনি । যদি তুমি দেশে ফিরিয়া বাইতে চাও, আবার জী পুত্র লইয়া সংসারী হইতে চাও চল তোমাকে কুল্পী লইয়া বাই, কোন নৌকার তুলিয়া দিব । আর যদি প্রভিজ্ঞা করিতে প্রার জী পুত্রের মুখ আর দেখিবে না তা হইলে, আমার সঙ্গে চল । ঘোর গহনে আমার কুটীর আছে, সেখানে আমার আরও শিষ্য আছে তুমিও শিষ্য হইবে । আমি আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেছি, কিন্তু এখনও

তাঁহার অস্ত্র পাইলাম না, বতদিন না পাইব ততদিন চিন্তাই করিব। দেখ আমার এ দেহের ক্ষয় নাই, পাঁচশত বৎসর পূর্বেও যাহা ছিলাম এখনও তাহাই আছি।

গণেশ আশ্চর্য্য হইলেন, ভাবিলেন এ কোন কপট সন্ন্যাসী, কাগজের ন্যায়, তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া মহাশক্তির নিকট বলি প্রদান করিবেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কে জানে সমুদ্রের হৃদয় কি পদার্থে গঠিত!। মুহূর্ত্ত পূর্বে যিনি মৃত্যুকে অনন্ত আবাঘের শক্তি নিকতন মনে করিয়াছিলেন, মৃত্যু হয় নাই বলিয়া বিপাতাকে কত ডাকিতেছিলেন, তিনি আবার বলিদানের কথা স্মরণ করিয়া গিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই ঐকৃত্য হইয়া বলিলেন, চলুন কোথায় যাইতে হইবে।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে সঙ্গে বন্দিয়া ঘোর গহনে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘোর বনে একটি ভয় ভূর্ণে সত্যসত্যই মহাশক্তির মন্দির, সেই মহাশক্তির মন্দিরে দেবীর সম্মুখে গণেশ দীক্ষিত হইলেন। তিনিও সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার মত আরও অনেক সন্ন্যাসী দেখিলেন, যখন দীক্ষিত হইলেন তখন বুঝিলেন ইহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, ইহারা কোনও গুঢ় কারণে সন্ন্যাসীর ভাণ করিয়া এই ঘোর কাননে অবস্থিতি করিতেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

—:o:—

স্বরা হৃদীকেশ হৃদি স্থিভেন ।

যথা নিবৃত্তোন্নি তথাকরোমি ॥

সন্ন্যাসী সেই পুরাণ ইষ্টকালয়ে হৈমবতীর বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । হৈমবতীর স্বামী জীবিত আছেন মনে করিয়া তাঁহার স্বামীর বিস্তর অহুস্কাহন করাইলেন । সন্ন্যাসী নদী তীর-বর্তী গ্রাম সকলে বিশেষ অহুস্কাহন করিলেন কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না । ক্রমে যখন হতাশ হইলেন, হৈমবতী কানিয়া বড় ব্যস্ত হইলেন । এদিকে সংবাদ পাইলেন বদেখর চৈতন্য ও হিজলকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, গণেশের জমিদারী আর একজনের হইয়াছে, এই সকল শোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ন্যাসী যথার্থ সাধুপ্রকৃতি, কিন্তু হৈমবতীর জন্য তাঁহাকে সংসারীর জ্ঞান চিন্তাশীল হইতে হইল । তিনি হৈমবতীর হাত দেখিয়া জানিতে পারিয়াছেন গণেশ এখনও জীবিত, হৈমবতী এক সময় রাজরাজেশ্বরী হইবেন । তাঁহার কথায় হৈমবতী এখনও জীবিত রহিয়াছেন । বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কই গণেশ ত আসিলেন না । হৈমবতী ক্রমশই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন । সন্ন্যাসী বুঝিলেন তাঁহার গণনা ভুল, সন্ন্যাস আশ্রম, জপ তপে তাঁহার অভক্তি জন্মিতে লাগিল । যে জগতে হৈমবতীর জ্ঞান সত্যসাধীর এই ভীষণ মৃত্যু যন্ত্রণা, সে জগতে আবার পাণ পুণ্যের বিচার কি ?

সন্ন্যাসী প্রাণপণে হৈমবতীর সেবাশ্রম করেন, হৈমবতী তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। হৈমবতী একদিন বলিলেন, পিতা আমার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে, মৃত্যুকালে আমি ও সন্তান দর্শন আমার অদৃষ্টে নাই, আমি কি পাণ করিয়াছি যে আমার অদৃষ্টে বিধাতা এত দুঃখ লিখিয়াছেন।

হৈমবতীর কথায় সন্ন্যাসীর বুকে শেল গিধিল, তিনি বথার্থই হৈমবতীর পিতা, এপর্যন্ত পরিচয় দেন নাই, হৈমবতী যখন বালিকা তিনি সংসারের মায়ী কষ্টাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া সাগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি গুরু নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা কল্পিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিক্ষা মিথ্যা হয় ত জানিবেন, যে জপতপ সবই মিথ্যা। তিনিই এই আশ্রমে ইহাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া নিজে তপস্তার অস্ত্র ঘোর বনে চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া ইহাঁর আশ্রমস্থিত ইহাঁর শিষ্যদিগকে লইয়া বান। গুরুদেবের প্রতি ইহাঁর এত ভক্তি যে তাঁহার কোন কার্যের প্রতি ইহাঁর বিদ্বেষাত্মক সন্দেহ হয় নাই। এইরূপে কত শত শিষ্য লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গুরুদেব যখনই আইসেন তিনি একা ছাড়া তাঁহার সহিত আর কেহ আইসে না।

আজ গুরুদেবের উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি যে বিদ্যা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন তাহা ত সমস্ত মিথ্যা। তাঁহার কথামত কত লোককে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। সে সকল লোক লইয়াই বা গুরুদেব কি করিয়াছেন? বিমূঢ়তা হইতে যে সমস্ত রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, গুরুদেবের প্ররোচনার তাহাদিগকে অসম্মত উপকার করিয়াছেন বলিয়া ভুলাইয়া সংসার

ভ্যাগে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইয়া কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছেন । এত নিষ্য লইয়া তিনি কি করিয়াছেন ? তবে কি গুরুদেব শক্তি উপসক ? কোন কাপালিক ভৈরব ? তিনি কি এত লোক মহাশক্তির স্থানে বলি দিয়াছেন ? এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল । তবে ত তাঁহার পাপের আয়শ্চিত্ত) নাই ?

• আজ হৈমবতীর গীড়া এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে জীবন সংশয়, হৈমবতী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন পিতঃ আমার সময় হইয়াছে আমি চলিলাম । মৃত্যু সময় একবার চৈতন্য ও হিঙ্গনকে দেখিতে, পাইলান না । মনে আমার ক্ষোভ রহিল । আমার স্বামী নাই থাকিলে নিশ্চয়ই একদিন আমাকে তিনি লইয়া যাইতেন । হৈমবতী রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন, তিনিযেন দেখিতে পাইলেন চৈতন্য ববনের বেগে তাঁহাকে ছুঁইতে আসিতেছেন, তিনি চীৎকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

সন্তানী একমনে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন মুদ্রিত, ভয়, পাছে নয়ন মেলিলে দেখিতে পান হৈমবতী হৈলোক ভ্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন । হৈমবতীকে তিনি আগন আগের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিয়াছেন । সেই হৈমবতী তাঁহার সামনে চলিয়া যায় । তিনি সন্তানী হইয়াও আজ গৃহী । তিনি এইরূপ কত চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কে তাঁহার হৃদয়ে হাত দিল । এত হইয়া নয়ন মেলিয়া দেখিলেন গুরুদেব, চৈতন্য, হিঙ্গন ও বিনয় তাঁহার সম্মুখে । তিনি প্রথমে মনে করিলেন তাঁহার ভ্রম মাত্র, পরে চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া দেখিলেন যথার্থই গুরুদেব, সেই যেত বেশ যেত

বেশ ও প্রশান্ত খেত মূর্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি যে কণ কালের
জন্তও সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহাতি আপনাআপনি কুণ্ঠিত
হইলেন ।

গুরুদেব বলিলেন “বৎস আমাকে সন্দেহ করিওনা, আমি
কাপালিক বা ভৈরব নহি আমি নরবলি দিই না । তুমি বত
শিষ্য আমাকে দিয়াছ সকলই জীবিত তোমার প্রত্যয়ের জন্ত
তোমাকে দেখাইব । তোমার মত আমার অনেক প্রধান
শিষ্য আছে, প্রত্যেকেই শিষ্য সংগ্রহে তৎপর । আমরা আর
কিছু কাল না আসিলে হৈমবতীর মৃত্যু হইত আমি জানিতে
পারিরা চৈতন্য ও হিঙ্গনকে লইয়া আসিয়াছি । ইহাদিগকে
আনিবার জন্ত আমি পাণ্ডুর গিয়াছিলাম এই জন্ত এতদিন
আসিতে পারি নাই ।

এই গুরুদেবই ফকীর বেশে রিজিয়াকে হৈমবতীর পীড়ার
বিষয় সংবাদ দিয়াছিলেন । এবং বিনয় ও চৈতন্যকে পাইয়াও
হিঙ্গনের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইরাছিল বলিয়া এতদিন
আসিতে পারেন নাই ।

সন্তাসী গুরুদেবের কথার অবাক হইলেন, গুরুদেব আপনি
অতর্ক্যামী আপনি সকলই জানিয়াছেন । আমার এগাপ মতি
কেন হইল, অথবা আমার মোহে আবদ্ধ হইলে লোকে বিবেক
শূন্য হয় আমার হৈমবতীর মায়ার তাহাই হইরাছে ।

গুরুদেব আপনার কমণ্ডলুহিত পানীর, হৈমবতীকে খাওয়া-
ইলেন হৈমবতীর তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইল । চৈতন্য ও
হিঙ্গনকে দেখিয়া তাঁহার শরীরে যেন বিগুণ বল হইল । তিনি
উঠিয়া বলিলেন ও গুরুদেবকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন ।

তাঁহকে কোথায় দেখিয়াছেন বোধ হইল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ।

চৈতন্য হিন্দু বিনয় ও হৈমবতী চারি জনেই অনেক-
কাল কাদিলেন কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না । হৈম-
বতীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মনে মনে ভাবিলেন আমিই
এই যন্ত্রণার মূল । আমি ত সাগরে যাইতে সম্মত ছিলাম না ।
আমিই তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলাম । রাজ্য ধন সবই
গিয়াছে, আমিও স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আমি অভাগিনী যন্ত্রণা
ভোগের জন্ত রহিয়াছি ।

তাঁহার কথা শুনিয়া গুরুদেব খিলিলেন মা তুমি রাজলক্ষ্মী,
তোমার কোনও দোষ নাই, তুমি বাহা করিয়াছ তাহা স্বর্গের
কাষ, স্বর্গ তোমার মতি দিয়াছিলেন । তুমিই বঙ্গ স্বাধীনতার
পথ পরিষ্কার করিয়াছ । তুমি বাহা করিয়াছিলে তাহা না
করিলে সুলতান গিয়াসউদ্দীন এখনও বঙ্গ সিংহাসনে আরুঢ়
থাকিতেন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা সহজ হইত না ।

মা, তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই । তিনিই হিন্দুর ভরসা,
আমরা তাঁহাকে লইয়া বঙ্গের সিংহাসনে বসাইব । বহু দিন
বঙ্গ স্বাধীন না হইবে তত দিন তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহী হইতে
পারিবেন না । তিনি আপাততঃ মহাশক্তির মন্দিরে এই প্রতি-
জ্ঞার আবদ্ধ, এখন তিনি সত্যসী আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে
তুমি ও চৈতন্য জীবিত কিন্তু তোমরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে
শ্রাদ্ধাদি করিয়াছ । সেই জন্ত তিনি এক্ষণে সংসারে বিরক্ত
এখন এ বেশে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন

না । আমার কথা শুন, যাহাতে তোমার ভাল হয় তাহাই করিব ।

এই বলিয়া গুরুদেব তাঁহাদের সকলকে লইয়া সেই ভগ্ন দুর্গে আসিলেন । ১৫২৭ল ও বিনয় প্রতিজ্ঞা বন্ধ হইয়া সন্তাসী হইলেন ।

হিন্দন ও হৈমবতী সেই দুর্গের এক কক্ষে রহিলেন ।

—:o:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—:~::~:—

ন বিদ্যা সঙ্গীতাং পরম্ ।

আজ মহাপূজা । খুব ধুম পড়িয়াছে । গুরুদেব সেই রাজ রাজেশ্বরী মহাশক্তির মন্দিরে ধ্যানে নিমগ্ন । মহাশক্তি সিংহারুড়া, দেবীর মূর্তি বহু মূল্য হীরা মণিমুক্তার ভূষিত, দেখিলে যথার্থই রাজ রাজেশ্বরী বলিয়া বোধ হয় । সন্তাসী এত অর্থ কোথায় পাইলেন ? জিজ্ঞাস্য জানেন । সে সময়ে হিন্দুর ধর্ম্মে এত আস্থা ছিল যে সামান্ত কৃষক হইতে প্রাসাদবাসী রাজা পর্যন্ত সকলই সন্তাসীর পূজা করিতেন বিশেষতঃ গুরুদেব হাত জগিলে পারিতেন তিনি কখনও সন্তাসী বেশে হিন্দুর নিকট কখনও ফকীর বেশে মুসলমানের নিকট উপস্থিত হইতেন হিন্দু ও মুসলমান হইতে সংগৃহীত অর্থে দেবীকে সাজাইতেন । রাত্রি বিপ্রহরের সময় মন্দিরের দ্বার উদ্বাটিত হইল । প্রথমে গণেশ, দেবীকে প্রণাম করিতে আসিলেন । তাঁহার বোধ হইল

দেবী পাবাণী নহেন, তিনি প্রণাম করিলে যেন দেবী তাঁহাকে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, দেবী যেন বথার্থ জীবন্ত সিংহের উপর আরুঢ়া, সিংহ ঘাড় ফুলাইয়া তাঁহার দিকে কটমট নেড়ে তাকাইল আর দেবী সেই মুহূর্ত্তে একটি শাণিত বর্ষা তাহার চক্ষের উপর ধরিলেন, একি ভ্রম, গণেশ বিস্ময়ে ও ভয়ে পুনরিত্ত হইলেন দৈববাণী হইল “হৈমবতী তোমাকে ত্যাগ করিয়া যান নাই। তোমাকে যখন কেলিয়া দেয় তোমাকে ধরিতে যাইয়া বাশের আঘাতে অট্টেতস্ত হইয়া নদীর গর্ভে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছেন, তিনি জীবিত, তুমি তাঁহাকে গ্রহণকর তিনিই বঙ্গের রাজলক্ষী গুরুদেবের আদেশমত কার্য্য কর বঙ্গেশ্বর হইবে, আকগানের রাজত্ব কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি হিন্দুর উপর প্রসন্ন।” তাঁহার সনে হইল যেন বহুদিনের অশ্রুত ও সেই বহুদিন স্তম্ভ মধুর স্বর, একি ? দেবী হৈমবতীর মুখে এই সব কথা বলাইতেছেন ? গণেশ চারিদিকে চাহিলেন দেখিলেন গুরুদেব ও সিংহারুঢ়া পাবাণময়ী দেবীমূর্ত্তি ভিন্ন সে দেবমন্দিরে আর কিছুই নাই গুরুদেব স্থির, নিশ্চল যেন তাঁহার চক্ষের পলক নাই। আবার দৈববাণী ! গণেশ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন “গুরুদেবের কথার বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি পাঁচশত বৎসর আমার তপত্তা করিতেছেন, আমি তাঁহার সাধনার প্রীত হইয়া হিন্দুর হইয়া আকগানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি বত দিন যুদ্ধ শেষ না হইবে তত দিন এই সিংহারুঢ়া হইয়া তোমাদের সহিত থাকিব, কৈলাসে যাইব না।”

গণেশ শুনিলেন ও চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু গুরুদেব ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

গুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, মহাশক্তি আজ স্বয়ং অবতীর্ণা তিনি আমাদিগকে যুদ্ধে লইয়া বাইবেন । আমরা দৈববলে, বলীয়ান্ আমাদের সহিত আফগানেরা যুদ্ধ করিতে পারিবে না । সত্য আমি স্বীকার করি, একজন আফগান, দশ জন হিন্দুর বল ধরে । কিন্তু যে মহাশক্তির নিকট বনের সিংহ পরাজিত, তিনি বাহাদের অগ্রণী তাহাদের আর ভয় কি ?

এই বলিয়া গুরুদেব সেই মূর্তিমতি মহাশক্তির সম্মুখে গণেশকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন, সব সন্ত্রাসীদিগকে ডাকিয়া সকলের বেশ পরিবর্তন করাইয়া যোদ্ধৃবেশে লাজাইলেন । গণেশ সেইস্থানে চৈতন্য ও বিনয়কে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না । পরে সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলে পর দেবী বলিলেন, গুরুদেব, এ ছলনা কি ভাল হুইল ? আপনার কথায় স্বামীকে ছলনা করিলাম । গুরুদেব বলিলেন, মা আমি ত কিছুই ছলনা করি নাট, তুমি ত যথার্থই হৈমবতী ! তুমি ত যথার্থই মহাশক্তি নতুবা তোমার পারের তলায় বনের সিংহ কি গুণে বশীভূত ? কোন মানুষ মানবী বনের সিংহকে এক্রপে বশ করিতে পারে ? হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন সে ত আপনার প্রদত্ত বিদ্যা । * পরে সেই দুর্দান্ত সিংহকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দেবী যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—○:○:○—

যতো ধর্মো ততো জয়ঃ ।

পরদিন প্রাতে গণেশকে লইয়া গুরুদেব সেই দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে গেলেন । সেখানে একটা দ্বার খুলিয়া নিম্নস্তরে লইয়া গেলেন । সেখানে যুদ্ধের উপযুক্ত কত বন্দুক, কাম্যুণ, তরবারি, বর্শা, তীর ধনু ও বারুদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখাটলেন । গণেশ অশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন গুরুদেব আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, সন্ন্যাসী হইলে আপনি এ সকল কোথায় পাঠলেন ? গুরুদেব বলিলেন বৎস আমি সন্ন্যাসী বই কিছুই নই । তাহা না হইলে তোমাকে খুঁজিব কেন, তোমাকে পাইনাই বলিয়া আজ দুইশত বৎসর মুসলমান রাজত্ব করিতেছে কিছুই করিতে পারি নাই । গণেশের একবার ইচ্ছা হইলে জিজ্ঞাসা করেন, যে এতদিন কি করিয়া বাঁচিয়া আছেন, আবার দেবীর দৈববাণী মনে হইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না । ‘মনে মনে স্থির করিলেন গুরুদেব যথার্থই কোন মহাপুরুষ । দুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের উদ্ধার করনার, যত্ন করিতেছেন । তাবিলেন ইহার মত মহাপুরুষ থাকিতে ভারত পরাধীন হইল কেন ? গুরুদেব যুদ্ধের উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া তাঁহাকে দুর্গের আর এক প্রান্তে লইয়া গেলেন সেখানে দেখিলেন অনূন বিশ সহস্র সসজ্জ বোদ্ধা যুদ্ধ বাজার জন্ত প্রস্তুত গুরুদেব এত লোক কোথায় পাইলেন ? ইহার

জন্মই কি প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলার যান ? ধন্ত গুরু-
দেব, তুমি যথার্থই দেবীর অমুগ্ধীত । গণেশ এই ভাবিতে ভাবিতে
সমস্ত সৈন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন । দেখিলেন তাঁহার যে সমস্ত
সৈন্ত ও সেনাপতি ছিল তাঁহার সমস্তই এখানে, তাহারাও
তাঁহাকে দেখিয়া জয়োন্মাদে উৎফুল্ল হইল ।

একজন সেনাপতিকে দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া •
গণেশ অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া পাণ্ডুয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন ।
গুরুদেব সঙ্গে চলিলেন । পূঁচ হাজার সৈন্ত ও বিস্তর অর্থ
দুর্গে রহিল । অবশিষ্ট পনের হাজার সৈন্য ও বিস্তর অর্থ লইয়া
গণেশ বন্ধেখর সমুদ্রদ্বীপের লক্ষাধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে
যাত্রা করিলেন । পথে দুই তিনটী সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইল ।
গণেশ জয়ী হইলেন । চারিদিকে প্রচার হইল যে অমরনাশিনী
দুর্গা সত্য সত্যই সিংহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের সময় গণেশের
সহায় হন । এই জন্য কোন হিন্দু জায়গীরদারের সৈন্য ভয়ে
গণেশের সৈন্যের সম্মুখীন হয় না । তিনি যেপথে যাটতে
লাগিলেন জায়গীরদারগণ বিনা ওজরে তাঁহার পথ ছাড়িয়া
দিতে লাগিলেন । যিনি যুদ্ধ করিলেন তিনিই হারিতে লাগি-
লেন, আর সত্য সত্যই দেবীমূর্তি যুদ্ধের সময় দেখা যাইত ।
গণেশ “হর হর ভজনী” বলিয়া ডাকিলেই যুদ্ধের সময় সাক্ষ্যৎ
ভবানী দেখিতে পাটতেন । তাঁহার সাহস বিশৃঙ্খল বাড়িতে
লাগিল । যখন গোড় হইতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত আসিয়া
উপস্থিত হইলেন তখন সমুদ্রদ্বীপের চৌতন্য হইল ।

গণেশ বলিয়া পাঠাইলেন, যে তাঁহার জমিদারী তাঁহাকে
ফিরাইয়া দিলে, ওরিজিয়া ও বেগম্ সাহেবাকে কারামুক্ত করিলে

তিনি সৈন্য লইয়া ভাটুরিয়ায় চলিয়া বাইবেন। কিন্তু সমস্তদীন উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন* বেগম সাহেবা ও রিজিয়াকে তিনি কাটিয়া ফেলিবেন আর শীঘ্র বুড়ে বাইয়া কাকেরদিগকে কুকুর-দিয়া খাওয়াইবেন।

—:0:—

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

—:::—

রিজিয়ারপত্র।

প্রিয়তম,

আজ আমার শেষ দিন। তাই আর কিছু গোপন করিবার আবশ্যক নাই। যে দিন তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম! সেই দিন হইতে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার মহান হৃদয়ে মিসিয়া গিয়াছে। আমার হৃদয় চৈতন্যময়, চৈতন্য আমারই, দূরে ও নিকটে তুমি যেখানেই থাক তুমি আমারই, আমি আফগান কস্তা, তোমাতে আমাতে একগুণে বিবাহ হইবে না তাহা জানি, তথাপি তুমিই আমার স্বামী, তুমি পুরুষ তোমার অনেক স্ত্রী হইতে পারে, তুমি হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করিও, আর যখন স্ত্রী হইবে তখন এই মৃত স্ত্রী রিজিয়ার কথা স্মরণ করিও। তুমি আমাকে ভাল বাসিয়াছ, তাহা তুমি না বলিলেও আমি জানিয়াছি। আমি এককাল যে দেবমूर्তি পূজা করিয়াছি সেই দেবতাকে যে আজ আমি স্বামী বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি!

ঠক। আমার পরম সৌভাগ্য। আজ তোমাকে সমুখে পাইলে স্বামী বলিয়া সোধোন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না। তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিতাম। আজ আমার মনে হইতেছে তুমি জন্ম জন্মে আমার স্বামী।

তোমাকে সুখী দেখিয়া যাইতে পারিলাম না এই ক্ষোভ রহিল। আজ তোমার জন্ম বাচিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু পিতৃহত্যা, পিতামহ পিতামহী হত্যা সমস্তদীন আজ আর কিছুতেই ছাড়িবেনা। আজ পাপিষ্ঠ আমাদিগকে কাটিবার জন্ম নিজে ত্বরবারি হস্তে, এই কারাগারে আসিয়াছিল। আমার সমুখে নারের অপমৃত্যু আমার অসহ্য! আমি যদি পুত্র হইতাম তাহা হইলে কি আমার মাকে আমার সমুখে গুণ্ডর মত কেহ বলি দিতে পারিত ?

আজ অনেক কষ্টে একদিনের জন্ম সময় পাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম আল কোরাণ পড়িতে পড়িতে মৃত্যুর জন্ম প্রাপ্ত হইব। কিন্তু কোন রকমেই কোরাণে মনোনিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। যতবার পড়িতে চেষ্টা করিলাম ততবারই তোমার দেবমূর্তি সমুখে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যেন তুমি বলেবর আর আমি তোমার পার্শ্বে বলেবরী। আমি কি বলিয়া হিন্দু রমণী হইয়া আসিয়া তোমার মহিষী হইব ?

আমার বড় সাধ ছিল তোমাকে কোরাণ পড়িয়া শুনাইব। পিতার আদেশে একজন বিখ্যাত মোল্ভীর নিকট কোরাণ শিক্ষা করিয়াছিলাম, তোমাকে যদি কোরাণ পড়িয়া শুনাইয়া তোমার মত পরিবর্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জন্ম সার্থক হইত। একথা আমি মনে স্থানদিতেও পারি না যে মুসলমান

না হঠলে স্বর্গে যাওয়া যায় না ; তবে হিন্দু ধর্মোপেক্ষা যে আমাদের সনাতন ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহার আর ভুল নাই। হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন কেন জানিনা। কুই আমি ত কোন হিন্দুকে ঘৃণা করিতে পারিনা। প্রাণাধিক, আমি তোমাকে ভাল বাগিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে ভাল বাগিতে শিখিয়াছি। বাগিকা বয়সে মৌলভীর নিকট শুনিয়াছিলাম হিন্দুরা ভৃত ও সন্ন্যাসিনের চর, কোন মুসলমান যত হিন্দু বধ করিতে পারিলেন তিনি ততই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইবেন, আমি তাহাই শিখিয়াছিলাম। হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। তোমাকে ও হিন্দুকে পাইয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। যিনি হিন্দুর অষ্টা তিনিই মুসলমানের অষ্টা, তিনি হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ জানেন না। তিনিই তোমাকে আমার জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমারই।

ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন তিনি আমার স্থানে যাঁহাকে পাঠাইবেন, তাঁহাকে ভাল বাগিও। তাঁহাকে রিজিয়া বলিয়া ডাকিও।

তোমারই রিজিয়া।

চৈতন্য এই পত্র পাইয়া বড়ই ভাবিত ও দুঃখিত হইলেন, যে রিজিয়ার জন্ত কারাগারে থাকিয়া একদিনের জন্তও কারা যন্ত্রণাভোগ করেন নাই, যিনি মুর্ত্তিমতী দেবীর স্মার তাঁহার অথের জন্ত যত্ন করিয়াছেন, সেই রিজিয়া তাঁহার জন্ত কারাগারে মরিতে বাইতেছেন এচিন্তা তাঁহার অসহ্য। যে কোন রকমে আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা না হইলে তিনি আর অজ্ঞ

ধরিবেন না। নিশ্চয়ই এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই স্থির করিয়া চৈতন্য পিতার নিকট বলিলেন আজই রাজ্যে পাণ্ডুরা হুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বেগম ও রিজিয়ার জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে তিনি আর অস্ত্র ধরিবেন না একথাও বলিলেন।

গণেশ তৎক্ষণাৎ হুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন।

—○:০০:○—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

পাণ্ডুরা বুদ্ধ ।

সমসুন্দীন প্রথমে গণেশকে একজনু সামান্য হিন্দু জমীদার মনে করিয়া কোনরূপ অয়োজন করেন নাই। পরে যখন দুই এক যুদ্ধে তাঁহার সৈন্য পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং লোকে বলিতে লাগিল যে গণেশ দৈববলে বলীয়ান, স্বয়ং সিংহবাহিনী হুর্গা তাঁহার বিজয়ের সময় যুদ্ধে আসিয়া আফগান সৈন্যদিগকে বিনাশ করেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি তাঁহার পিতামহের মত নির্ভীক ও প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। হুর্গা স্বয়ং জীবন্ত সিংহারূঢ়া হইয়া যে যুদ্ধে আসেন ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। গণেশ তাঁহার সৈন্যকে ভয় দেখাইবার জন্য ইহা প্রচার করিয়াছেন স্থির করিয়া তিনি সেনাগণকে আহ্বৃত করিবার জন্য মৌলভী ডাকাইয়া কোরাণ হইতে কবচ লিখিয়া

লইলেন । এইঃ আপনি বুকে বাইবেন স্থির করিলেন । যুদ্ধে বাইবার পূর্বে তিনি বৃদ্ধা পিতামহী ও পিতৃশ্রমা রিজিয়ারকে হত্যা করিবেন স্থির করিলেন । তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে রিজিয়া চৈতন্যকে ছাড়িয়া দিয়াই এই গৌলযোগ বাধাইয়াছেন । চৈতন্য এত অর্থ কোথায় পাইলেন নিশ্চয়ই রিজিয়া তাঁহার পিতার ধনগার হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছেন । তাঁহার আরও সন্দেহ হইয়াছিল যে রিজিয়ার চরিত্র ভাল নয় । তিনি ঘোর নারকী রিজিয়ার দেব চরিত্রেও যে তাঁহার সন্দেহ হইবে ইহাতে বিচিৎ কি ।

ঘোর আঁধার বাড়ি । মুবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে । যেন জালয় বাল উপস্থিত । মহা কড় কড় শব্দে যেন পৃথিবী একএকবার কাঁপিয়া উঠিতেছে । প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে ।

এই সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এই ঝড় বৃষ্টি মাগার করিয়া, গণেশ তাঁহার সৈন্ত লইয়া পাণ্ডুরার দুর্গ আক্রমণে বাইতেছেন । সম্মুখে প্রবল গজা, পার হইয়া বাইতে হইবে । পার হইবার সময় কোনরূপে সুলতান জানিতে পারিলে একজন ও ফিরিবে না । যুদ্ধে হারিলেও পুনরায় নদী পার হইয়া অর্ধেক সৈন্ত ফিরিতে পারিবে কি না সন্দেহ, গণেশ এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে অশ্বপূর্বে দ্রুত বেগে গজাতীরাভিমুখে ছুটয়াছেন । মুবল ধারার তাঁহার ও অশ্বের পারীর প্লাবিত । কিছুই দেখা যায় না । মধ্যে মধ্যে এক একবার বিছাডের আলোকে দেখিতে পাইলেন অদূরে এক এক কুটারে প্রহরীগণ আগুন জালিয়া পাহারা দিতেছে । গণেশ স্থির করিলেন এ আঁধার রাত্রে এই ঝড় বৃষ্টিতে নদী পার হইবার চেষ্টা করা বৃথা, অনেক

সৈন্ত ও অশ্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিশেষতঃ চারিদিকে এত প্রহরী একজন যদি পলাইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অতি অল্প কাল মধ্যেই সুলতান সংবাদ পাইবেন । এই স্থির করিয়া গণেশ যেমন অশ্বের মুখ কিরাইবেন অমনি দেখিতে পাঠলেন সিংহবাহিনী দুর্গা তাঁহার সম্মুখে । বিছাতের আলোকে সেই অপূর্ণ অ্যোতির্শ্বর মুখের শোভা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন । এ কি সত্য ? না তাঁহার ভ্রম ? আবার ঘোর আঁধারে সব মিসাইয়া গেল । তিনি ভুলিলেন যেন সেই নৈশগগণ ভেদ করিয়া স্বর্গীয় স্বরে কে বলিল, “গণেশ, নদী পার হইতে ভয় পাও না ঘোর আঁধার রুদ্ধিতে পার না হইলে আর কাল পার হইতে পারিবে না । এই বিশাল নদীতে বর্ষার স্রোতে তোমার সৈন্ত কিছুতেই বিপক্ষের কামানের মুখে পার হইতে পারিবে না । তাই আজ আমার আদেশে ঘোর আঁধারে পৃথিবী আবরিত । আর মহা প্রলয়ের ঝড় দৃষ্টিতে পৃথিবী কম্পিত ও প্লাবিত এই কয়জন প্রহরীকে বন্দী করিতে পারিলেই নির্দ্বিগ্নে সৈন্ত পার করিতে পারিবে ।”

গণেশ বিষয়ে চারিদিকে তাকাইলেন সকলই নিস্তর তাঁহার মনে হইলে যেন হৈমবতীর সেই বহুদিন অশ্রুত স্বর তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে । হৈমবতী কি স্বর্গে যাইয়াও তাঁহার কথা ভাবেন ? হৈমবতীই কি তাঁহাকে স্বর্গ হইতে এই কথা বলিয়া দিতেছেন ?

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় কে তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া অশ্বের গতি রোধ করিল, তিনি বটাতট হইতে তরবারি নিকোষিত করিতে স্ফাইয়া দৌলিলেন সম্মুখে

আর কেহই নহেন তাঁহারই গুরুদেব । তিনি লজ্জিত হইয়া তরবারী রাখিয়া বলিলেন গুরুদেব, আপনি এত রাজ্যে এই দুর্ঘোষে এখানে কেন ?

গুরুদেব বলিলেন বৎস আমি গঙ্গান্নানে আসিয়াছি । আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর গঙ্গান্নানে সময় অসময় কি ? স্নান করিতে বাইতেছি এমন সময় যেন দেখিতে পাইলাম ভগবতী মহাদেবী মহাসিংহারূঢ়া হইয়া তোমাকে সসৈন্ত আজই রাজ্যে গঙ্গা পার হইতে বলিতেছেন । আমি বুদ্ধ আমার ভ্রম হইতে পারে হয়ত বা বায়ুর স্বপ্ননানি শুনিয়া আমার ভ্রম হইয়াছে । তুমি কি কিছু দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ ?

গুরুদেব, এ ভ্রম নহে সত্য সত্যই মহাশক্তি আজ হিন্দু পুনরুদ্ধারের জন্ত আমার সহায় হইয়াছেন, আমি এই রাজ্য তাঁহাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার কথা শুনিয়াছি । আজই আমি ও চৈতন্য গঙ্গা পার হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিব । গঙ্গার ধারে ও দুর্গের পথে যে সকল গ্রহরী আছে তাহাদিগকে বন্দী বা বিনষ্ট করিবার জন্ত চৈতন্য ও বিনয়কে অল্প সৈন্য লইয়া পাঠাইয়া আমি সমগ্র সৈন্য লইয়া অদ্যই রাজ্যে পার হইয়া যাইব ।

তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ শিবির হইতে বিনয় ও চৈতন্য পঞ্চাশ জন যোদ্ধা লইয়া গঙ্গা পার হইয়া গেলেন । ঘাটিতে ঘাটিতে নিঃশব্দে গ্রহরীদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বাধিয়া রাখিয়া দিলেন । ক্রমে তাঁহারা দুর্গের বাহির পরিধার সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন দেখিলেন, সর্বনাশ ! দুর্গ-বাসী জাগরিত, তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত

অগ্রসর হইতেছে। শেষ ঘাটী হইতে বোধ হয় একজন গ্রহরী পলাইয়া যাইয়া সংবাদ দিয়াছিল। 'এই সেতু রক্ষা করিতে না পারিলে পিতা যে সৈন্য লইয়া পার হইতে পারিবেন না তাহা চৈত্মল বোধ বুঝিলেন। পঞ্চাশ জন সৈন্য লইয়া তিনি অস্থতঃ এক ঘণ্টা অনায়াসে এই সেতুর পরপারে স্থলতানের সৈন্য আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন তাহাও তাঁহার বোধ হইল তিনি বিনয়কে আদেশ দিলেন শীঘ্র যাও, পিতাকে সংবাদ দেও। তুমি না আসা পর্য্যন্ত আমি সেতু রক্ষা করিব।

বিনয় নক্ষত্র বেগে অশ্ব ছুটাইয়া উড়িয়া গেলেন।

স্থলতান এত নিকটে কক্ষরকে দেখিয়া অগিয়া উঠিলেন, চৈত্মলকে জীবন্ত ধরিবার জন্ত আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্ত-গণ সেতুর নিকট আসিয়া চৈত্মলকে আক্রমণ করিল। চৈত্মল স্থিরভাবে সেতু রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীগণ একটা একটা করিয়া মরিতে লাগিল, ক্রমে মুসলমান সৈন্তগণ এত নিকট আসিল যে তাহারা পরস্পরকে চৈত্মল ও তাঁহার অবশিষ্ট সঙ্গীগণকে সেতু সহিত তাহাদের পারে টানিয়া লইয়া যাইবে এমন সময় বিনয় প্রায় দুই সহস্র সৈন্ত লইয়া সেতুর অপরপারে আসিয়া পড়িলেন। তাহাদের "হর হর ভবানী" রবে নৈশগগন কাঁপিয়া উঠিল।

চৈত্মল বিনয়কে দেখিয়া নাড়িয়া উঠিলেন, বিনয় বলিলেন পিতা বলিয়াছেন আর এক ঘণ্টাকাল সেতু রাখিতে পারিলে তিনি পার হইয়া আসিবেন। চৈত্মল বলিলেন একঘণ্টা, দুইঘণ্টা যত ঘণ্টা আবশ্যক আমি সেতু রক্ষা করিব। এই বলিয়া তিনি একটা কামান ঘুরাইয়া সেতুর মুখে স্থাপন করিয়া

চারিদিকে মৃত্যু ছড়াইতে লাগিলেন। পাঠানেরা কিছুপূর্বে বাহাদিগকে অনায়াসলভ্য শীকার মনে করিয়াছিল তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল। অনেকে গড়খাই সাতরাইয়া পার হইবার চেষ্টা করিল, অনেকে জলি খাটয়া সেই গড়খাইতে চিরদিনের জন্য ডুবিল। বাহারা উঠিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে মরিল। এদিকে পূর্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল, মুসলমানেরা দেখিল হিন্দু সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া ছুর্গ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, চারিদিকে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিল। মেঘ গর্জন থামিল। কিন্তু রক্ত স্রোত বহিল, ও কামান গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল ॥

সমসুদ্দীন অনায়াসে ছুর্গে প্রবেশ করিয়া দুই মাস অন্ততঃ ছুর্গরক্ষা করিতে পারিতেন তিনি তাহা করিলেন না! কি কাফেরের ভয়ে তিনি ইচ্ছার মত বিবরে লুকাইবেন? তিনি ছুর্গের বাহিরে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বোদ্ধা। হিন্দুর সহিত যুদ্ধে আফগানেরা চিরদিনই জয়ী হইতেন। সেই সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আফগানেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে মৃতদেহের গাহাড় হইতে লাগিল। সুলতানের কামান শ্রেণী হিন্দু সৈন্যের সর্বনাশ করিতে লাগিল। গণেশ দেখিলেন, কামান থাকিতে আর রক্ষা নাই। হিন্দুর কামান অপেক্ষা মুসলমানের কামান চতুর্ভুজ, হিন্দুর কামান ছোট। হিন্দুর কামানে মুসলমানের বে সৈন্য মরিতে লাগিল মুসলমানের কামানে তাহার চতুর্ভুজ হিন্দু সৈন্য মরিতে লাগিল।

হিন্দু সৈন্য পলায়ন পর হইয়া উঠিল। গণেশ অশ্বপৃষ্ঠে একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া সৈন্যদিগকে কিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে মৃত ও মৃত আর সৈন্যের দেহের স্তূপ হইতে লাগিল। তিনি চৈতন্যকে ডাকিয়া বলিলেন, এ কেবল নরহত্যা করা হইতেছে, আর যুদ্ধ করা সম্ভবে না। চৈতন্য তাঁহার কথা বুঝিলেন। কোন উত্তর না দিয়া খড়্গ ও বন্দুক হস্তে কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য লইয়া জুলতানের গোলান্দ্রুদিগকে অমাত্মিক হেজে আক্রমণ করিলেন। আর শতাবধিক কামান অধিকার করিয়া সেই কামান ঘুরাইয়া জুলতানের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে আর সন্ধ্যা হইয়া আসিল। “হর হর ভবানী” রবে নৈশগগন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান সৈন্যগণ দেখিতে পাইল সত্য সত্যই জীবন্ত সিংহারুড়া অশ্বরশ্মিনী ছর্গা হিন্দু-সৈন্যের অগ্রণী—তাহারা ভীত ও দ্রুত হইল। আবার তাহাদের কামানেই তাহাদের শত সহস্র সৈন্য মরিতে লাগিল। জুলতান কিছুতেই আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল।

আফগান সৈন্য চারিদিকে পলাইতে লাগিল সত্য কিন্তু সমস্তকীন পলাইলেন না। যে হিন্দু তাঁহার পদে দলিত, যে তাঁহার চক্ষে কাফের, তাহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি অসিহস্তে, কিন্তু সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চারিদিকে গোলা গুলি পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার কিছুই হইল না। তিনি কবচ

ধারণা করিয়া অজ্ঞের হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা । তিনি উঠেঃস্বরে এই কথা বলিয়া ও হৃদমনীর তেজ দেখাইয়া কতক জলি পলায়ন পর গৈন্য ফিরাইয়া একদল হিন্দু সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন । রাতি প্রায় বিশ্রহর গণেশ “হর হর ভবানী” রবে সেই স্থানে আসিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইবার জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার এক পার্শ্বে স্বয়ং অমরনাশিনী মহাশক্তি । গণেশ শুনিলেন, যেন দেববাণী হইল “জলতানের শরীর কবচে রক্ষিত, মহাশক্তির শাণিত বর্ষায় উহার মৃত্যু, যিনি বঙ্গের জলতান তিনি ববন হইলেও পৃথিবীতে দেবতা, মাছুয়ে তাঁহাকে মারিতে পারে ন।” । এই কথাগুলি কে যেন ভীষণস্বরে উচ্চারণ করিল । সেই স্বর যুদ্ধের কোলাহল ভেদ করিয়া জলতান ও গণেশের কানে গেল । মকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল সেই অমরনাশিনী মহাশক্তি স্বয়ং জলতানকে আক্রমণ করিয়া শাণিত বর্ষার আঘাতে তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন ।

জলতানকে পড়িতে দেখিয়া পলায়মান ববন সৈন্ত একে-বারে চতুর্দিকে ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল । এইরূপে প্রায় দুই শত বৎসরের পর বঙ্গ স্বাধীন হইল ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

—•:0:•—

তুমি মানবী নও বথার্থই দেবী !!

যুদ্ধাবসানে গণেশ রাজপুরী অধিকার করির' বন্দেবর সিংহ-
সনে আসীন হইলেন । গুরুদেবের আদেশে মহাসমাবেশে
মহাশক্তি পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন । আজ হৈম-
বতীর চিত্তা তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়া তাঁহাকে বড়ই কাতর
করিল । গুরুদেব বলিয়াছিলেন হৈমবতী জীবিত আছেন ।
কিন্তু যে হৈমবতী তাঁহাকে মৃত বলিয়া নদীতীরে ফেলিয়া
গিয়াছেন, সেই হৈমবতীর নিকট তিনি বথার্থই মৃত । এজীবনে
তাঁহার সহিত আর হৈমবতীর সাক্ষাৎ অসম্ভব । আজ এই
মহাশক্তি পূজার পর চৈতন্যকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া গণেশ
সন্ন্যাসীর বেশে গঙ্গাসাগরে চলিয়া যাইলেন । গঙ্গাসাগরে
হৈমবতী মৃত্যুজ্ঞানে তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেই গঙ্গা-
সাগরে মরিয়া পর জীবনে আবার হৈমবতীর সহিত মিলিত
হইলেন । এজীবনে তাঁহার সকলই শেষ হইয়াছে ।

গুরুদেব তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন । বলিলেন গণেশ
হৈমবতী দেবী, মানবী নছেন । তিনি স্বর্গে তোমারই জন্য
অপেক্ষা করিতেছেন । তিনি তোমাকে ইচ্ছায় ফেলিয়া বান
সাই । বে মুহূর্ত্তে নির্দয় সজীপণ তোমাকে নদীতীরে ফেলিয়া
দিয়াছিল সেই মুহূর্ত্তে তিনিও তোমার সহিত লাকাইয়া তীরে
পড়িতেছিলেন, কিন্তু যত্নকে গুরুত্ব আঘাত পাইয়া অচেতন্য

হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে সেই নির্দম রাক্ষসগণ
মৃত্যুযুগে ফেলিয়া দিয়া অর্নায়াকে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। ঠৈম-
বতী অমরতা লাভ করিয়াছেন। তুমি বঙ্গরাজ্য অংশাগন করিয়া
সময়ে অমরতা লাভ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য পাইবে।

গণেশের চক্ষে জল আসিল, কহিলেন গুরুদেব! একথা পূর্বে
বলেন নাই কেন। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; আমি সেই
সভীসাক্ষীর সহিত মিলিত হইবার অমুণ্যুক্ত। আমি তাঁহাকে
রাক্ষসীজ্ঞানে ঘৃণা করিয়াছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।
আদেশ করুন আমি সাগরে যাইয়া তপস্বী করিয়া জীবন অতি-
বাহিত করি।

গুরুদেব বলিলেন যদি আজ মহাশক্তি পূজার সন্তুষ্ট হইয়া
ঠৈমবতীকে স্বর্গ হইতে সশরীরে আনিয়া দেন তাহা হইলে
তাঁহাকে গ্রহণ করিও। যদি তাঁহাকে না পাও তাঁহার স্থানে
অস্ত্র দার পরিগ্রহ করিয়া সুখী হইও। তুমি বহুদিন এই হিন্দু
মুসলমান অধিবাসিত বঙ্গাংশাগন করিয়া হিন্দু মুসলমানে সত্তাব
সংস্থাপন কর। নতুবা ঠৈমবতী এদেশে শাসন করিতে পারিবেনা।
অচিরে মুসলমানের হস্তে পুনরায় বঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।
আমি সন্তোষী হইয়া মৃত্যু হতম করিয়াছি সেই পাপের জন্য
আমার নিজের জীবন মহাশক্তির নিকট উৎসর্গ করিয়া পাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিব স্থির করিয়াছি। তুমি না থাকিলে যৌননের
অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতে ঠৈমবতী ও বিনয়কে কে রক্ষা করিবে?
এই অস্ত্র বলি তুমি স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া রাজ্যরাজেশ্বর হইয়া হিন্দু
মুসলমান অপত্য নির্বিশেষে শাসন কর।

গণেশ গুরুদেবের কথায় মনে ব্যথা পাইলেন । বলিলেন গুরুদেব হৈমবতীকে যেদিন বিস্মৃত হইবে সেদিন আমার নরকেও স্থান হইবে না । হৈমবতী বথার্থ দেবী ছিলেন । আমি দৈববাণীতে তাঁহারই স্বর শুনিতে পাই । হা বিধাতঃ হৈমবতীকে ভুলিয়া আমি অজ্ঞ জ্ঞী লইয়া সুখে রাজ্য করিব ! গুরুদেব বলিলেন তবে তাঁহার মুখ দেখিবেনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কেন ?

গণেশ বলিলেন মানুষ আপনার হৃৎ ও যন্ত্রণা আপনি ডাকিয়া আনে । আমিও তাঁহাই করিয়াছিলাম । সেই স্বর্গারূঢ়া পবিত্রহৃদয়া সাধ্বীর প্রতি যে কণকালের জন্তও বিরক্ত হইয়া তাঁহার মূর্তি ঘণার চক্ষে কলন করিয়াছিলাম সেই পাপের জন্ত আমার কদপিও উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাহার প্রারশ্চিত্য করিব । আমার সেই পাপ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্তই ত সেই সতী অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন ।

গুরুদেব বলিলেন চল আজ মহাশক্তির মন্দিরে, পূজার পর যাহা করিতে চাও করিও ।

এই বলিয়া উভয়ে সেই মহাশক্তির আরাধনার্থ মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন ।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে । মহাশক্তি পূজার পর অধিকাংশ দীপ নির্বাপিত । স্তিমিত আলোকে গণেশ দেখিলেন যেন সেই মহামহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরী মহাশক্তি ক্লপিণী সিংহবাহিনী মহাদেবী মূর্তিমতি তাঁহার সম্মুখে বিরাজিতা । যেন ধীরে ধীরে সিংহ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন । একি স্বপ্ন ? গণেশ চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন

গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই তপায় নাই। সেই খেতকেশ খেতবেশ সন্ন্যাসী ডাকিলেন সা হৈমবতী, তুমি যথার্থই হৈমবতী, তোমারই কৃপায় অহর বিনাস হইয়াছে। আর কেন, যথেষ্ট কষ্ট ও যত্ন দিয়াছি। তুমি বলেশ্বরী হইয়া পতি পুত্র লইয়া সুখী হও।

দেবীমূর্তি যথার্থই সেই জীবন্ত সিংহ হইতে অবরোহণ করিয়া গণেশের পায় পড়িলেন, গণেশ ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। একি ? গুরুদেব, একি ইচ্ছাজাল ! জীবন্ত সিংহ কিভাবে বন্দীকৃত, সত্য-সত্যই কি হৈমবতীকে ফিরিয়া পাইলাম। গুরুদেব ! যদি ইচ্ছাজালী হয় ত চিরকালই আমি যেন এইরূপ মোহমস্ত থাকি, আমি আর সত্যের আলোকে আলোকিত হইতে চাহি না।

গুরুদেব বলিলেন বৎস ইহা ইচ্ছাজাল নহে। সত্য সত্যই তুমি হৈমবতীকে ফিরিয়া পাইলে। হৈমবতীর গুণে বনের সিংহ তাহার বাঁধন। তুমি যে সূক্তের সময় ও দেবমন্দিরে মহাশক্তির মূর্তি দেখিয়াছিলে তাহা হৈমবতীর মূর্তি যে দৈববাণী শুনিয়াছিলে তাহা হৈমবতীরই উক্তি।

হৈমবতী কাদিতে কাদিতে বলিলেন আমি, প্রভো, আনাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার সহিত চলনা করিয়াছি মহাপাপ করিয়াছি। গুরুদেবের কথার ভুলিয়াছিলাম। যে পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাট, আমাকে চলনা করিয়াছি। মাহুয মাঝিবার জন্ত উৎসাহিত করিয়াছি, মাহুযী হইয়া দেবী সাজিয়াছি মাহুযী হইয়া মাহুযের পূজা গ্রহণ করিয়াছি।

গণেশ আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন হৈমবতী তুমি মাহুতী
নও তুমি যথার্থই দেবী ।

—:o:—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

—o:o:o—

প্রভাগুকার নী প্রেম ?

চৈতন্য বুদ্ধাবসানে কারাগারে যাইয়া বেগমের ও রিজিয়ার
অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের পাইলেন না ।
তাঁহার অন্তরাব্দা শুকাইয়া গেল তবে কি ছরাত্মা সমস্তদীন
যুদ্ধের পূর্বেই তাঁহাদিগকে মারিয়া কেলিয়াছে । কারা রক্ষকের
নিকট গেলেন যে বেগম ও রিজিয়া সাধারণ কারাগারে
ছিলেন না, তাঁহারা কি অবস্থায় আছেন তাহা তিনি
বলিতে পারেন না ।

চৈতন্য ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল
যেন সকল পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে । যেন তাঁহার হৃদয় শূন্য ।
কতকাল পরে আজ বঙ্গ স্বাধীন । কতকাল পরে পিতামাতার
সন্দর্শন পাইরাছেন আজ তাঁহার কি আনন্দের দিন ! কিন্তু
এ সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না । তাঁহার হৃদয়
রিজিয়ারময় । হায়, যৌবনে প্রেম এইরূপই হৃদয়কে উদ্ভাস্ত
করে । তখন প্রেমিকের হৃদয় মন্দিরের উপাস্ত দেবতা ভিন্ন
এই বিশাল ধরার আর যাহা কিছু আছে তাহা বিস্মৃতির

অগাধ জ্বলে ডুবিয়া যায়। পাঠক তুমি আজ দার্শনিক হইয়াছ আজ অনারাগেই বুঝিতেছ যে চৈতন্য কি পাগল কিন্তু তোমার হৃদয়ের অন্তত্বল হইতে বল দেখি তুমি কি কোনও দিন এইরূপ উদ্ভাস হও নাই। যদি না হইয়া থাক তুমিই শত্রু ।

চৈতন্য কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলেন তাহা তাঁহার চৈতন্ত্য নাই। এই কারাগার হইতে তাঁহার আর বাহিরে বাইবার সাধ নাই। রিজিয়ার পত্রে জানিয়াছিলেন তিনি কারাগারে। তবে কি কারারক্ষক তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন ?

এই কারারক্ষক রিজিয়ার ভূধন মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সম-শুদ্ধীনের ভয়ে এতদিন কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। যখন সংবাদ পাইলেন যে যুদ্ধে সমশুদ্ধীনের মৃত্যু হইয়াছে তখন তিনি রিজিয়ারকে আপনার বাসনা জানাইলেন। রিজিয়া হৃৎস্তের চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতেন। তিনি অনেক অমুনর করিয়া বলিলেন “আপনি, আমার রক্ষাকর্তা, আমি আপনার বন্দিনী, আপনি আমার পিতার সমতুল্য আপনি ওরূপ কথা মুখে আনিলেও আপনার পাপ হয়।

খাঁ গাহেব “ভেবা ভোবা” পুড়িয়া বলিলেন “আজ আমি কোন কথায় ভুলিব না, আজ আর তুমি স্নানতানের কেহ নও, যে তোমাকে ভয় করিব। ‘আজ আমার কথা ন’ শুনিলে তোমাকে আমি জোর করিয়া বিবাহ করিব। কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ রিজিয়ারকে অস্ত্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বেগমকে অস্ত্র একটা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বৈশ্বকর্ম।

হার, বাহাদের সুখের জন্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে গিয়াস-উদ্দীন কুতিত হইতেন না। বাহাদের সুখের জন্ত তাঁহার বঙ্গ সাম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র বোধ হইত সেই বেগম ও সোনার পুতলী রিজিয়া আজ একজন সামান্য হুবৃত্ত কারাধ্যক্ষের হস্তে অগ-মানিত। হে জগদীশ্বর তুমিই জান, কেন মানবের অদৃষ্টে এই অবস্থা বিপর্যয়।

বেগম প্রথমে অনেক অশ্রু নর করিলেন পরে গালি দিলেন। কিন্তু হুবৃত্ত কিছুতেই শুনিয়া না। রিজিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন আমাকে স্পর্শ করিওনা, কোথায় বাইতে হইবে বল আমি বাটতেছি, আমার নিকটে আসিওনা, যদি আইস হয় তুমি মরিবে না হয় আমি মরিব, এই দেখ এই বলিয়া রিজিয়া একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইলেন, বলিলেন যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার নিকটে আসিও আমি এই ছুরী তোমার বুকে বসাইব পরে আপনার বুকে বসাইয়া সেই পাথরের স্তম্ভ-শিখর করিব।

রিজিয়ার কথায় হুবৃত্তের ভয় হইল, হীন বল রমণীর হস্ত হইতে ছুরী অন্য সময় অনায়াসেই লইতে পারিবে মনে করিয়া এবং এখন বল প্রকাশ করিলে পাছে রিজিয়া আপন গলায় ছুরীবসাইয়া দেয় এই ভয়ে আর কিছু বলিল না। বলিল আইস আমার সহিত, এই বলিয়া ভিন্ন কক্ষে তাঁহাকে লইয়া বন্ধ করিয়া রাখিল।

চৈতন্যময় বধন আসিলেন তখন রিজিয়াকে ভিন্নস্থানে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু রিজিয়া ও বেগম যে এই কারাগার ছিলেন তাহা তাঁহার

সম্পন্ন হইল। এক এক করিয়া সমস্ত বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার অন্তর্নি বদনে বলিল তাহার রিজিয়া ও বেগমের নাম ও কখনও শুনে নাই। . ডর, কিছু বলিলে কারা-খান পরে তাহাদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখিবে না।

৫২য়ন এই কারাগারে একটা ঘরে দেখিলেন দুইটা বন্দী ঐকিবার স্থান অল্প ঘর অপেক্ষা এই ঘরটা অপেক্ষাকৃত পরি-ষ্কার। শয্যা সামস্ত বন্দীর শয্যার অপেক্ষা অনেক শুণে পরিষ্কৃত তিনি অল্প মনে সেই শয্যা তুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন একখানি পত্র তাঁহারই নামাক্ষিত ও রিজিয়ার হস্ত লিখিত তিনি পত্র খানি হস্তে লইবামাত্র কারাখান বুঝিতে পারিল যে এই সমান্তহুত্রে তাহার সমস্ত পাপ ধরা পড়িলে। আর উপায় নাই। জগদীশ্বর এইরূপ সামান্ত হস্ত রাখিয়াই পাপীর পাপ ধরাইয়া দেন। শত সহস্র চেষ্টে করিয়াও সে নিস্তার পায় না।

—:০:—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:::—

রিজিয়ার দ্বিতীয় পত্র।

কারাগারে।

তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। তুমি আমার স্বামী কিন্তু তুমি স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলে আপনাকে অপমানিত মনে করিবে, কারণ আমি মুসলমান তুমি হিন্দু।

আমি হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে তোমাকে দেবতা বলিয়া স্থাপন করিয়াছি। সেই মন্দির হইতে সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও আমার সেই দেবতা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সেই বিবরে আমি নিশ্চিত। আমি জন্ম জন্মান্তরেও তোমাকে পাইব। এজন্মে তোমার সহিত আমার লৌকিক বিবাহ হয় নাট, হইতেও পারিবে না কারণ কোন নোজা আমার বিবাহ দিবে না, দিলেও ধর্মশাস্ত্র মতে তাহা বিবাহ গণ্য হইবে না। সেই জন্ত বলিতেছি, দিন-বিবাহ না করিয়া ও ধর্মের চক্ষে জন্ম জন্মান্তরের জন্ত আগার স্বামী তাঁহাকে কি বলিয়া গবেষণ করিল? আমি কুঙ্করুদ্ভি রমণী আমি জানি না তুমি বলিয়া দিও।

আজ তুমি সমুদ্রকূলের সহিত জয়ী হইবে মনেই নাই, শুনিয়াছি তোমার পিতা দৈববলে বলিয়ান্। যে পক্ষে ধর্ম সে পক্ষে জৈবর সহায় হন একথা অলীক নহে। তাহা না হইলে আমি মুসলমান কত্কা হইয়াও আজ হিন্দু জয় কামনা করিতেছি কেন? যে জাতির সিংহাসন পিতৃরক্তে কলঙ্কিত যে জাতির সিংহাসন আমার ভক্তি ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নয় সে জাতির সিংহাসন কখনও স্থায়ী হইতে পারেনা, তাই আজ জৈবর তোমাদিগকে আনিতেছেন। শুনিয়াছি তোমার পিতা বিচক্ষণ তাঁহাকে বলিও হিন্দু মুসলমান উভয় তাঁহার সম্মান, উভয়কে সমান চক্ষে দেখিতে, দেখিও তাহা হইলে মুসলমানগণ আর তাঁহাকে কাকের বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবে না।

তোমার সহিত আর দেখা হইবে না, নাই হটক, তাগতে আর হুংখ নাই, আমি যেখানে যুগ্মবাহার থাকি আমি

তোমারই—যতদিন বাঁচিব তোমার ঐ দেবমূর্তি ধ্যান করিব। আমার একটা প্রার্থনা আছে, এই শেষ—আমি মরিলে সমাধির সমস্ত আশিও। আমি সংবাদ দিবার উপায় করিয়া রাখিয়া দাইব। যেখানে আমার সমাধি হইবে, সেই সমাধি ভবনে তোমার প্রতিমূর্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিও। আমি সমাধিতল হইতে ঐ দেবমূর্তি দেখিতে পাইব। তুমি আমাকে ভালবাস তাই তোমার নিকট এই আবদার। যদি বল তুমি আমাকে ভাল বাস আমি কি করিয়া জানিলাম, যদি না জানিতাম তাহা হইলে তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতাম না। জগদ্ধারে তুমি আমার স্বামী ছিলে। মন জগদ্বস্তুর সঙ্গতিজ্ঞ। সেই জ্ঞান জানিয়াছি। যদি মুসলমান কভার সমাধি ভবনে তোমার প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলে তোমার কেহ নিন্দা করে সে নিন্দা গ্রাহ্য করিওনা। যিনি তোমার রাণী হইবেন তাঁহাকে এই পত্র দেখাইও। তিনি আমাকে ভগিনী জ্ঞানে আমার এই প্রার্থনার অসম্মত হইবেন না। তোমাকে আমি তাঁহাকে দিয়া গেলাম। আমি প্রতিদানে প্রতিমূর্তি আকাজিকিনী এই কথা তাঁহাকে বলিও।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সুখী হও। হিজনে আমার কথা বলিও। এখনও বিনয় হিজনের বাসোপযোগী রাজ-প্রাসাদ পাইবেন। হিজন কতদিনে সেই প্রাসাদে রাজরাণী হইবে? যদি বাঁচিয়া থাকি আমি সেই সুখের দিনে অধিষ্ঠান হইব।

আর এক কথা, মৃত্যু কি? মৃত্যু কি উন্নততর জীবনের পথ নয়? আমার দিন নিকট হইয়াও আমার সন্নিধ্য দাইতেছে।

আমি এই কারাধ্যক্ষের শাপ আকাজক্ষার দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুই একমাত্র পথ স্থির করিয়াছি ।

কলহিনী হইয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ এরূপ বিপদে পড়িয়া আত্মহত্যা করিলে পাপ হয় কি ? আমাদের বংশে প্রায় কেহই শাস্তিতে মরিতে পায় না, সেই জন্যই বোধ হয় দৈবের আশাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন, অন্য অবস্থায় আত্মহত্যা করিলে গাতকিনী হইতাম, আত্মহত্যা আগার অদৃষ্টের লিখন, তাই এই দিব্য অবস্থায় পড়িয়াছি । আমি এ অবস্থায় মরিলে আমাকে আত্মঘাতিনী বলিয়া দ্বণা করিওনা ।

আর একটা কথা, এই কারাধ্যক্ষ নরপিশাচ । যদি কখনও তোমার ক্ষমতা হয় ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিও । এ নরপিশাচ কারাধ্যক্ষ হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । ইহাকে তাড়াইয়া দিও । কিন্তু ইহার দ্রী পুত্রকে ভুলিওনা ।

আজ এজন্মের মত বিদায় দেও, আবার বখন তোমাকে পাইব তখন আর বিদায় লইতে হইবেনা ।”

“রিজিয়া ।”

চৈতন্য এই পত্র পড়িয়া সব নুঝিলেন । রাগে ও দুঃখে তাহার শরীর কঁপিতে লাগিল । তিনি কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন “রিজিয়া কোথায় ?” সে নরনাথ স্থির স্বরে উত্তর দিল “আমি জানি না ।”

চৈতন্য তাহার এই উত্তরে একেবারে অলিয়া উঠিলেন । তাহাকে ধরিয়া নিকটস্থ গবাক্ষে বাধিয়া তরবারি নিক্ষেপিত করিয়া কাটিতে গেলেন । তখন সে প্রাণ ভরে আতুল হইয়া

বলিল আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। আমি দেখাইয়া দিব।

চৈতন্য তাহার বন্ধন খুলিয়া দুই জন সৈনিকের তত্ত্বে তাহাকে দিয়া বলিলেন “চল, কোথায় সেই কারাগার, দেখাইবে চল।”

চৈতন্য রিজিয়াকে ও বেগমকে কারামুক্ত করিয়া রাজ পুরীতে তাঁহাদের পূর্বস্থানে স্থাপন করিলেন।

দুইশত বর্ষ পরে আজ বঙ্গ স্বাধীন। আজ আবার বঙ্গ বঙ্গেশ্বরের রাজ্যাভিষেক। মহাসমারোহে গণেশ স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রার সহিত তৌল হইলেন। সেই ধনরাশি সমগত হিন্দু ও মুসলমান ভিত্তরীণগকে বিতরণ হইল। গণেশ প্রথমে হিন্দু মতে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পরে মুসলমান সুলতানের বেশ পরিধান করিয়া কোরোণাক্ত মতে অভিষিক্ত হইলেন। হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইল। হিন্দু বলিল, গণেশ আমাদের রাজা মুসলমান বলিল গণেশ আমাদের সুলতান। গণেশ বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন বলিলেন আমি রাজা কি সুলতান কিছুই নই। আমি প্রজা সেবক। মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই আমার প্রজা, সুতরাং আমার সন্তান। সেই ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত গণেশ জীবিত ছিলেন কখনও হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয় নাই। আর একবার হইয়াছিল, সে তাহার মৃত্যুর পর। হিন্দু তাহার শবদাহন করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল মুসলমান তাহার শব সমাধিস্থ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। কোন্ দেশে কোন্ রাজা এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাকে বশীভূত করিতে

পারিয়াছেন ? আমরা কেবল উপন্যাস লিখিতেছি না । যাঁহারা ইতিহাস পাঠকরিয়াছেন । তাঁহার এতটুকু অবগত আছেন ।

—:0:—

উন বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:0:—

ভাল বাসার পরিণাম ।

রিজিয়াকে কারামুক্ত করিবার পর চৈৎমল আর তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই । যতবার তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন, তত বারই রিজিয়া কোন ও না কোন কারণে তাঁহার সঙ্কিত সাক্ষাত করিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইয়াছেন । চৈৎমলের হৃদয় রিজিয়াময়, রিজিয়া তাহা জানেন । সেই জন্যই তিনি সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন । রিজিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে না দেখিলে চৈৎমল ক্রমে নিজের হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারিবেন । রিজিয়া এখন পরম সুখী, তিনি হিঙ্গন ও বিনয়ের সুখে সুখী, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার আকাজক্ষণী, তাঁহার সুখে সুখী । কিন্তু চৈৎমলের মনে সুখ ও শান্তি নাই । রিজিয়ার তুলনায় শত বঙ্গরাজ্য ও তাঁহার নিকটত্ব, তাঁহার হৃদয় বিজিয়াময় । যিনি বিপদের সময় তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ, যিনি সুলতান পুত্রী হইয়া সামান্য বন্দীর জন্ত বদ্ববতী যিনি রূপে ও গুণে অতুলনীয়, তিনি আজ

উদরারের জন্ত পর মুখাপেক্ষিণী, এ চিন্তা চৈত্মনের অসহ্য। কি করিলে তিনি সুখী হন; কেন তিনি তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহাকে ভাল বাসিয়াই তাঁহার এই দুর্দশা এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে শেলসম বিদ্ধ করিল। এ জীবনে রিজিয়া তাঁহার হাতে পারেন না, তিনিও রিজিয়াকে পাইবেন না তাহা তিনি স্থিরসাধন।

হৈমবতী ও বেগম উভয়েই রিজিয়া ও চৈত্মনের মনের গতি বুঝিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। কি উপায়ে তাঁহাদের রক্ষা করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। স্বপ্নাবলম্বী কোন যুক্তিকে বিবাহ করিবার জন্ত বেগম রিজিয়াকে অনুরোধ করিলেন হৈমবতী কত অমুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু রিজিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি হৈমবতীকে বুঝাইলেন যে মনে মনে তিনি চৈত্মনকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাঁহার কি আর বিবাহ হইতে পারে? একজন্মে তিনি চৈত্মনের মূর্তি পূজা করিয়া পরজন্মে তাঁহাকেই স্বামী পাইবেন। একজন্মে তিনি ত চৈত্মনের আকাঙ্ক্ষিণী নহেন, একজন্মে আরম চৈত্মনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি চৈত্মনের পক্ষে মৃত যখন সময় হইকে তিনি চলিয়া যাউবেন, স্বর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। সেখানে ঈশ্বর হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ দেখেন না।

হৈমবতীর চক্ষে জল আসিল তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন রিজিয়া তুমিই সতী, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন। ভাবিলেন রিজিয়া দেবী, তিনি কখন ও যবন কড়া নহেন।

হৈমবতীর হিন্দু ধর্মের এত শ্রদ্ধাছিল যে চৈতন্যমন্ডল ও রিজিয়া তাঁতার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইলেও, তাঁহাদের বিবাহ দিতে কোন মতেই সন্মত হইতে পারিলেন না। তিনি বঙ্গের মহারাজী হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু আর কখনও রিজিয়াকে বিবাহ করিবার জন্ত বলিতেন না। তিনি জানিতেন চৈতন্যমন্ডল তাঁহার কি তাহার গিতার কথা কেলিতে পারিবেন না। এই জন্ত তিনি বিবাহের জন্ত কখনও অনুরোধ করেন নাই। আর গণেশকেও কখন অনুরোধ করিতে দেন নাই।

গণেশ যখন দেখিলেন চৈতন্যমন্ডল বিবাহ করিলে অসুখী হইবেন তখন তাঁতার আশাছাড়িয়া দিয়া মহাসমারোহে হিন্দন ও বিনরের বিবাহ দিলেন। তাঁহার বিবাহের সময় রিজিয়া পিতৃদত্ত বহু মূল্য বসন ও ভূষণে হিন্দনকে সাজাইলেন, সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন আজ এই বসন ভূষণ সার্থক হইল। তোমার উজ্জ্বল আভার স্বর্ণ ও মণিময় অলঙ্কারেরও শোভা হইয়াছে।

হিন্দন বলিলেন যে সুন্দর সে সকলকেই সুন্দর দেখে। তুমি আপনার রূপ বুদ্ধি আমাতে দেখিতেছ। এই মণিময় ভূষণে তোমার ঐ শ্রীজঙ্গম ভূবিত কুর দেখিবে স্বর্গ বিদ্যাধরী। কি মূর্তিমতী সৌদামনী ভূতলে। অবতীর্ণা তোমার ও ভ্রম হইবে। তুমি সত্য সত্যই এত সুন্দর যে আমি যদি পুরুষ হইতাম আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া বসিতাম।

রিজিয়া উত্তর দিলেন সত্য সত্যই কি তুমি এই বসন কল্লাকে বিবাহ করিতে? আমাকে কি মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করিতে না?

হিঁজন বলিলেন আমি কখনও কাহাকেও ঘৃণা করিনাই।
যে দিন তোমাকে ঘৃণা করিব সে দিন যেন অশনি পড়েন
আমার মৃত্যু হয়। ঈশ্বর কাহাকেও হিন্দু ও মুসলমান করিয়া সৃষ্টি
করেন নাই যখন তাঁহার নিকট হইতে আসি তখন আমরা
সবই এক, শিক্ষা বিভিন্নতায় ধর্মের বিভিন্নতা হয়, তাই বলিয়া
পূরস্পরে ঘৃণা করিব কেন। আমরা সকলেই সেই এক পিতার
সন্তান—সেই পিতার ইচ্ছায় আজ আমরা একস্থানে একই
উদ্দেশ্যে মিলিয়াছি। তবে আমিই বা তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব
কেন আর তুমিই বা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে কেন ?

রিজিয়া বলিলেন হো'ন, রাগ করিওনা, আমি একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি ও মুসলমানকে ঘৃণা করনা,
কোনও মুসলমানকে তুমি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পার ?

হিঁজন বলিলেন ‘বিনয় আমার স্বামী, বিনয় মুসলমান
হইলে ও আমি তাঁহাকে সেই একই চক্ষে দেখিব। বিনয়
হিন্দু সন্তান না হইয়া যদি মুসলমান সন্তান হইতেন আমি
তাঁহাকেই বিবাহ করিতাম। হিন্দু হইয়া কি মুসলমান বিবাহ
করা যায় না ?

রিজিয়া কোন উত্তর দিলেন না। অলঙ্কার পরাইয়া শেষ
করিয়া বলিলেন, ঠিক যেন পত্নী, দেখিও পাখা বাহির করিয়া
উড়িয়া যাইয়া বিনয়কে ফাঁকি দিওনা। এই বলিয়া হাসিতে
হাসিতে রিজিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—○:○:○—

ধর্ম পরিবর্তন ।

পিতার পরলোকান্তে চৈতন্য নব্বের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তিনি এপর্যন্ত দার পত্রিগ্রহ করেন নাই । বেগম, হৈমবতী ও হিন্দন কত অনুরোধ, উপরোধ করিয়াও তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে পারেন নাই ।

তিনি বঙ্গেশ্বর হইয়া কখনও রিজিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টাও করেন নাই । বাল্যকাল হইতে অভ্যাস বশতঃ তিনি পাঠানের ক্রয় বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিতেন । বঙ্গেশ্বর হইয়াও সেইরূপ চলিতে লাগিল । মৌলভীর কাছে কোরাণ শিখিতেন, ক্রমে তাঁহার মতের পরিবর্তন হইতে লাগিল । হৈমবতীর মৃত্যুর পর তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । কোথা হইতে এক ফকীর আসিয়া তাঁহাকে মসজীদে লইয়া কল্মা পড়াষ্টল ও তাঁহাকে গর্ক প্রথম জালালউদ্দীন নামে সম্বোধন করিল । চৈতন্য ভাবিলেন বাহা জগদীশ্বরের ইচ্ছা তাহা তিনি কি করিয়া খণ্ডাইবেন করিয়া অদৃষ্টে বাহা থাকে তাহা কে লজ্জন করিতে পারে ?

মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে তিনি রিজিয়ার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া ও সাক্ষাৎ না পাইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন ।

রিজিয়া!—

যেদিন প্রথমে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেদিন আমি একজন সামান্ত বন্দী। তুমি দেশের সুলতানের অতি আদরের কন্যা, তুমি যে আনার হুঃখে হুঃখিত হইতে পার ইহা আমার ধারণা হইত না। আমার জন্ত তোমার যত্ন দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। ভাবিতাম তুমি স্বর্গের দেবী, মানবী নহ। তোমাকে ভাল বাসিতাম কিন্তু অতি সংগোপনে, কেননা লোকে জানিলে আমাকে পাগল বলিত। আর তুমি? তুমিত সকলকেই ভাল বাসিতে, বিনয়, হিন্দন ও আর কত আশাদের মত হতভাগ্য বন্দী তোমার দয়ার ভাজন ছিল। সকলেই তোমাকে দেবী বলিয়া মনে করিত। কারাগারে তুমি আসিলে কারাগারও হাসিত। বন্দিগণের যত্নগা কনিত। তুমি দিনান্তে একবার আসিতে বলিয়া ভয়ে কাঁদাধাক কাঁদারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। আমি প্রভাৎ তোমার আশায় পথ চাহিয়া থাকিতাম, তুমি আসিলে আনার এই অন্ধ-কারময় জীবন আলোকিত হইত। তখন জানিতাম পিতামাতা স্বর্গে। আমাকে চিরদিনই তোমার পিতার কারাগারেই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যখন তোমাকে দেখিতাম তখন মনে হইত কোন স্বর্গের দেবতা মানবীরূপে আমাকে আশা দিবার জন্ত আসিয়াছেন। তোমার আশায় আমি বন্দী হইতে বঙ্গেশ্বর হইয়া এখনও উর্দ্ধে চাহিয়া আছি, জানিনা আরও কতদিন থাকিব।

বঙ্গেশ্বর হইয়াও ত সুখী হইতে পারিলাম না। যখন বন্দী ছিলাম তুমি আমার জন্ত ভাবিতে, প্রভাৎ দেখিতে আসিতে

বন্দী হইয়াও তাহাতে আমার যে সুখ ছিল এখন বঙ্গেশ্বর হইয়াও ত সে সুখ নাই। হে ঈশ্বর তুমি বঙ্গরাজ্য বিনিময়ে, আমাকে গিয়াসদ্দীনের সেই কারাগারে লইয়া সিনাতে সেই দেবীমূর্তি দেখিতে দেও।

লোকে বলিবে আমি তোমার জন্ত মুসলমান হইরাছি। বলুক হুঃখ নাই, তোমার জন্ত আমি কি না পারি? তুমি কোরাণ পড়, এই জন্ত কোরাণ পড়িতে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল সত্য, কোরাণ পড়িয়া বুঝিলাম কোরাণোক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম, সেই ধর্মেও আমাদের বেদোক্ত ধর্মে কোন বিভিন্নতা দেখিলাম না। যদি মসজিদে গেলে দুর্দান্ত প্রাঠানগণ আমার বশীভূত থাকে। তবে মসজিদে বাটতে ত আমি কোন দোষ দেখিতে পাইনা, তাই দোষিত হইরাছি। ইহাতে বিনয় ও হিঙ্গন বড় মনে ব্যথা পাই-
য়াছেন। তুমি হিঙ্গনের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিও। আমি দেশের রাজা। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় আমাকে তাহাই করিতে চেষ্টা। নিজের সুখ খুঁজিলে চলিবে কেন।

আজ সাত বৎসর তোমাকে দেখি নাই এ জন্যে আর দেখা হইবেনা। আমি বুঝিয়াছি আমার সহিত দেখা হইলে তোমার কষ্ট হয় সেই জন্ত এই সাত বৎসরের মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। কিন্তু একদিনের জন্তও তুমি আমার মনো-
মন্দির ছাড়িয়া বাটতে পার নাই। যে মূর্তি তথায় স্থাপিত করি-
য়াছি মন্দির না ভাঙ্গিলে আর তাহা কেহ লইতে পারিবেনা।

ঈশ্বরের চোঁড়া হইলে অন্তরূপ হইত। তাহার ইচ্ছা নয় এই জন্ত এ দ্বীপে আমি ও তুমি হইয়াও আমরা মিলিত হইতে পারিলাম না। পর জীবনে মিলিব। সে দিনের জন্ত আমি

ব্যস্ত নই কারণ সেদিন আসিবেই, এজীবনে ঈশ্বরের কাজ না করিলে পর জীবনে তাঁহার কাছে সেই দিনে কি বলিয়া দাঁড়াইব ?

চৈতন্যল্ল ।”

রিজিয়া পত্র পড়িয়া হুঃখিত হইলেন। বুঝিলেন তিনি যে চৈতন্যল্লকে ভাল বাসেন একথা তাঁহাকে জানাইয়া ভাল করেন নাই। তাহা না হইলে চৈতন্যল্ল বিবাহ করিয়া সুখী হইতেন। “ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অন্তরূপ হইত।” এই কথা শুনি তাঁহার প্রাণে বাঁজিল। তিনি চৈতন্যল্লের পত্রের উত্তরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার লোক পত্র লইয়া গেল তখন জেলালাউদ্দীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দূত কিরিয়া আসিয়া রিজিয়াকে এই কথা জানাইল।

রিজিয়া পত্রখানি আবার পড়িলেন। “আজ সত বৎসর তোমাকে দেখি নাই এতদ্বারা আর দেখা হইবে না।”

রিজিয়া বুঝিলেন চৈতন্যল্ল কেন একথা লিখিয়াছেন। তিনি এবুঝিলেন তাঁহার জন্তই এ ভীষণ যুদ্ধ হইতে তাঁহার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। বিনয়কে রাজ্য ভারদিয়া তিনি চিরদিনের জন্ত চলিয়া গিয়াছেন।

আজ কত কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি কেন চৈতন্যল্লের কথায় পূর্বে তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই, তখন তিনি হিন্দু ছিলেন তখন তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলে ত

লোকে বলিতে পারিত না যে চৈতন্যের তাঁহার জন্ত স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন । এখন চৈতন্য এই কলঙ্কের ভার মাথায় করিয়া আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন কেন? এই জন্ত তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছেন রিজিয়া ভাবিলেন তিনি শতবার জীবন দিলেও কি সময় জোড় হইতে এই সাতটা বৎসর খসিয়া পড়ে না ?

তিনি এতরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় হিঙ্গন আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিলেন, তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন “কি হিঙ্গন, দিদি আসিয়াছ ?

হিঙ্গন বলিলেন আমি আক্ষিয়াছি তুমিত আর আগাকে ভাল আসনা । যাকে ভাল বাস তাহাকেও চির দিনের মত বিদায় দিয়া নিশ্চল হইয়াছ । তবুও ত ভাবনা যায় না ।

ছি, দিদি অমন কথা বলিতে নাই । তোমার দাদা যুদ্ধ জয় করিয়া আবার লীল্যই আসিবেন ।

হিঙ্গন বলিলেন “এজয়ে না পরভায়ে” এই বলিয়া চৈতন্যের একখানি লিপি তাঁহাকে দেখাইলেন ।

রিজিয়া পড়িলেন ।

“হিঙ্গন——

দিল্লির বাদশাহ্ মামুদতোগলাক আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন । আমি পিতৃদত্ত রাজ্য পাইয়াছি জীবন থাকিতে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিব না । আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলাম । তিনি আমার রাজ্যে পঁহুঁছবার পূর্বেই আমি, তাঁহাকে আক্রমণ করিব ।

শুনিতে পাই তৈমূব নামক একজন তাতার দেশীয় সত্ৰাট বাদসাহের সহিত মিলিত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছেন। তৈমুরের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভের আশা নাই, আমি জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া যুদ্ধে যাইতেছি। আমি পরাস্ত হইলে ও তাতার সত্ৰাট বুকিবেন যে তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভাল করেন নাই এ যুদ্ধে তাঁহার ও আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

আমার অনুগৃহীতি বাল্যে বিনা রাজ প্রতিনিধি রহিলেন। পাঠানগণ অতি দুর্দান্ত, যদি আমি না ফিরিয়া আসি তোমরা কোরাণ মত দীক্ষিত হইয়া গাজীদের বশীভূত রাখিতে চেষ্টা করিও। অল্প কোন উপায়ে গাজীদের বশীভূত করিতে পারিবে না। আমি মুসলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম কোন বিভিন্নতা ত দেখিতে পাই না। পরিলক্ষ্যে ও আহায়ে কি ধার্মিকের ধর্ম নষ্ট হয়?

আমি মরিলে আমার জন্ত কাঁদিও না। ইতি

তোমার দাদা চৈতন্যল।”

হিজন পত্র শুনিয়া আবার কাঁদিলেন। রিজিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া আপন মন্দিরে লইয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—○:○:○—

অশনি পতন।

শায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভারত দেশে তৈমুর নামে এক জন মহা পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি নানাদেশ জয় করিয়া অবশেষে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। মামুদ তোগলক তখন দিল্লির বাদশাহ, তিনি তৈমুরের সহিত যুদ্ধে পবাস্ত হইয়া তাহার শরণাগত হইলেন এবং দিল্লির দ্বার খুলিয়া দিলেন।

তৈমুরের সৈন্তগণ অমাত্যিক অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন পাঠান ওমরাহগণ গাজীদিগকে মাতাইয়া তুলিলেন তাহারা তৈমুরের সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিল। তৈমুর এই সুযোগই খুঁজিতে ছিলেন : তিনি আদেশ দিলেন “নগরে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক আছে সকলকেই বন্দী কর ও কাটিয়া ফেল”। এই ভীষণ জ্ঞানদেশ সত্য মতাই কার্য্যে পরিণত হইল। পাঁচ দিন ধরিয়া এই হত্যাফাঁদ চলিল।

প্রথম দিনে এক লক্ষ লোককে কাটিয়া ফেলা হইল, প্ত সহস্র রমণী পৈশাচিক অত্যাচারে ভগ্নহৃদয়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পিষাচ প্রকৃতি তৈমুর ইহাতে আমোদ ভিন্ন কষ্টের কোন কারণ দেখিলেন না। পাঁচ দিন অহোরাত্র এইরূপ হত্যাব্যাপার চলিল। কত পৈশাচিক অত্যাচার হইল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাদশাহ আমুদ আর সহ্য করিতে

পারিলেন না, পঞ্চম দিনে তৈমুরের নিকট যাইয়া তিনি যুক্ত-
করে প্রজার শ্রাণ ও ধান ভিক্ষা চাহিলেন । আপনার রাজ
মুকুট তৈমুরের পদ প্রান্তে রাখিলেন । তখন তৈমুর আদেশ
দিলেন “আরনা” । তৎক্ষণাৎ তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য যেন কোন
নহ্নবলে ঈলজালে মুগ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল । মাহ্মুদে যে মাহ্মুদের
হৃদয়ের উপর বিরূপ প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে পারে ইহা তাহার
একটি উদাহরণ স্থল ।

এই ভয়ানক পাপাচারের পর তৈমুর মসজিদে যাইয়া নমাজ
করিতে বসিলেন, একমনে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে লাগি-
লেন । জগদীশ্বর জানেন মাহ্মুদের মন কি পদার্থে গঠিত ।

তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী জনশূন্য স্থানে পরিণত হইল ।
তিনি দিল্লীর ধনগার লুণ্ঠ করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলেন ।
মামুদ তাঁহাকে বলিলেন বাঙ্গালা ও বেহার লুণ্ঠ করিলে আরও
অনেক অর্থ পাওয়া যাইবে । সেই প্রলোভনে তৈমুর বাদশাহের
সহিত মিলিত হইয়া চৈত্মলের রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্ত
যাত্রা করিলেন । ‘চৈত্মল ইহা জানিতে পারিয়া বিরূপে অগ্রেই
বুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । বেহারের
উত্তর প্রদেশে হিমচলের পাদপ্রান্তে যেখানে উত্তর সম্রাটের
সৈন্য ছাউনি করিয়াছিল তাহার পাঁচ কোশ দূরে চৈত্মল
সৈন্যে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিয়া রহিলেন ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাতি ভুলে,

মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন ।

যখন আফগান আমিরগণ জানিতে পারিলেন যে সুলতান জালালউদ্দীন তৈমুরের সঙ্ঘিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন তাঁহারা বাদশাহকে পরিত্যাগ করিয়া জালালউদ্দীনের সহিত মিলিত হইলেন সহস্র সহস্র গীর্জী ক্রোধে ও জিগীষায় মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি করিল। একে গাজীগণ ভয়ানক ক্রোধপ্রবণ তাহাতে তৈমুর ও তাঁহার সৈন্যের পৈশাচিক অত্যাচারে তাহারা একেবারে মরিয়া হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে তৈমুর জালালউদ্দীনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মামুদ ভোগলক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, তিনি বলিলেন এখনও তৈমুরের সমস্ত তামতার সৈন্য আসিয়া পৌছায় নাই, তাঁহার নিজের সৈন্য ও সেনাপতিগণকে তিনি বিশ্বাস করেন না। কি জানি যদি বিদ্রোহী হটয়া তাহারা যুদ্ধের সময় বঙ্গের সুলতানের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে বিপদ ঘটতে পারে। তৈমুর বাদশাহের কথায় হাসিলেন, বিপদের নামে তাঁহার তামতার শোণিত উত্তপ্ত হটয়া উঠিল, যুদ্ধে তিনি চিরদিনই জয়ী, তিনি পরাস্ত হইতে পারেন বাদশাহ যে এই সন্দেহ করিয়াছেন ইহাতে তিনি বড়ই বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যে কালই প্রাতে

তিনি যুদ্ধ করিবেন। তৎক্ষণাৎ ছাউনি ভাঙ্গিয়া যুদ্ধ বাজার
আয়োজন হইতে লাগিল।

প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল চৈতন্যের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্ত
গণ মরিয়া হইয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষার তৈমুরের তাতার সৈন্তের
সম্মুখীন হইল। বাদশাহ মামুদ ভোগলক যাহা আশঙ্কা করিয়া
ছিলেন কার্য্যতঃ তাহাই হইল। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্তই
শত্রুর লে মিলিত হইল, চৈতন্যের সৈন্তগণ ইহাতে দ্বিগুণ উৎ-
সাহিত হইল। কিন্তু তৈমুরের তাতার সৈন্তগণ ক্ষুধার্ত্ত সিংহের
জায় চুরিদিকে মৃত্যু ছড়াইতে লাগিল। সে ভীষণ দৃশ্য বর্ণনা-
ভীত। দুই প্রহর ধরিয়া যেন পিশাচে পিশাচে মহাশয় কালে
পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত। রণক্ষেত্র মৃত দেহে আবরিত হইল,
অগ্ন্যারোহীর পদতলে দগিত আহত ও মৃতপ্রায় সৈন্তের আর্ত-
নাদে ও উভয় সৈন্তের বিকট কোলাহলে রণক্ষেত্র যেন পিশা-
চের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। এই তৈমুরের জয়, এই চৈত-
ন্যের জয়। অবশেষে প্রায় দুই প্রহরের সময় চৈতন্যের
তিনদল বাছা বাছা গাজি পোদ ও নমশূদ্র সৈন্ত একেবারে
তাতার সৈন্তশ্রেণী ভেদ করিয়া, তৈমুরের শিবির আক্রমণ
করিয়া বসিল, তৈমুর স্বয়ং তরবারি ও বন্দুক হস্তে সামান্য
সৈন্তের জায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তরবারির আঘাতে ও
বন্দুকের গুলিতে তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার
শরীর শোণিতে ভাসিয়া বাইতে লাগিল তথাপি দৃকপাত নাই
এদিকে চৈতন্যও বস্তাক্ত কলেবরে সমস্ত তাতার সৈন্ত ভিন্ন
ভিন্ন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের জায়
উভয়ে উভয়ের উপর পড়িলেন, চৈতন্য ডাকিয়া বলিলেন আজ

তোমার ও আমার শেষদিন, উভয়ে তববারির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, তাঁহাদের রক্তার জন্ত উভয় দলের সহস্র সহস্র যোদ্ধা সেই দিকে ঝুঁকিল। সেস্থানে হত ও আহত দেহের পাচাড় হইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে বর্ষার আঘাতে অচৈতন্ত হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পড়িয়া গেলেন।

তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কবিবার জন্ত শত শত তরবারি একে-বারে উখিত হইল, কিন্তু ভূমে পড়িয়া মাত্র দুইজন অশ্বারোহী লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আপন আপন অশ্বে তুলিয়া কোণায় উড়িয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বারোহীদ্বয় তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রের বহুদূরে ফৌজদারের প্রাসাদে লইয়া তাঁহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন পরে আপন আপন বেশ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদের গুণাবায় নিযুক্ত হইলেন।

যখন চৈতন্য ও চৈতন্যের চৈতন্য হইল তখন তাঁহারা দেখিলেন দুইটা রমণী তাঁহাদের গুণাবায় নিযুক্ত, তৈমুর তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চৈতন্য দেখিলেন রিজিয়া ও হিজিন। তাঁহাদের তথায় দেখিয়া অবাক হইলেন। সেই দুর্দান্ত ভাভার পতিকে তথায় দেখিয়া তত্তোষিক আশ্চর্য্য হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে যখন সৈন্তগণ দেখিল চৈতন্য ও চৈতন্য নাই তখন উভয় দলই বুদ্ধে বিরত হইল ও আপন আপন ছাউনিতে ঘাইয়া প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

উপরোক্ত ঘটনার একমাস পরে চৈতন্য মহা সমারোহে, রিজিয়ার সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিলেন তিনি রিজিয়ার গুণে

এত মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে আপন কস্তুর জ্বায় ভাল বাসিতে লাগিলেন তিনি রিজিয়ার অমুরোধে আর কখনও বুখা নরহত্যা করেন নাই।" রিজিয়া পিতৃহীনা হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তৈমুরের যত্নে ও স্নেহে তিনি পিতৃশোক ভুলিতে বাধ্য হইলেন রিজিয়ার বিবাহের দিন হিঙ্গন মনের সাথে যেখানে যা সাজে তাহাই দিয়া তাঁহাকে সাজাইলেন তিনি বহুমূল্য মণিময় স্বর্ণ অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিয়া বলিলেন, দিদি তোমার বিবাহ কি আজ? বিবাহ একবার ছাড়া কি দুবার হয়?

ঈদার কিছুকাল পরে রিজিয়ার প্রার্থনা মত মামুদ ভোগলককে দিল্লীব সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৈমুর স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে আর কখনও তিনি ভারত সাম্রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। যতদিন জীবিত ছিলেন, সুলতান জালালউদ্দীনকে পুত্রের জায় ভাল বাসিতেন। বৎস-রাষ্ট্রে মহাসমারোহে তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন।

জালালউদ্দীন পাণ্ডুয়া হইতে রাজধানী গোড়ে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। "সেই মহানগরীকে কত মনোহর" অট্টালিকার ও মসজিদে সাজাইলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান একই চক্ষে দেখিতেন। তিনি রিজিয়ার সহিত বহু বৎসর মহা সুখে রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে আপন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। তাতারসম্রাট ও তাঁহার বংশে পুরুষাত্মকনে সেইরূপ সৌহার্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বহু বৎসর পরে যখন চৈতন্যমলের পুত্র আহম্মদ সাহা বিপদে পড়িয়া তৈমুরের পুত্র ফারোকের শরণাগত হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার বিপদদ্বার করিয়া দিয়াছিলেন। "রিজিয়া রমণী হইয়াও গিরানক্ষত্রের

নষ্ট রাজ্য এইরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন । তাহারই গুণে নাসুদ
তোগলক তাহার সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন । ইহার পরও
কি কেহ বলিবেন যে মুসলমান রমণীগণ পদ্যাদ ভিত্তর থাকিয়া
জীবন অতিবাহিত করেন সংসারের কোন উপকারে আইসেন
না ? ১৫২২র অনেক আত্মীয় স্বজনকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত
করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনয় ও হিজনকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে
পারিলেন না । তাহার গণেশের জমিদারী পাইয়া ভাটুরিয়ায়
রাজা ও রাণী হইয়া রহিলেন । কত শত বৎসর চলিয়া
গিয়াছে এখনও এই রাজবংশ বর্তমান রহিয়াছেন ।

—○:০০:○—

সমাপ্ত

—:::—

